DURER BHOR

DURER BHOR

by

BUDDHADEB GUHA

দূরের ভোর

বুদ্ধদেব গুহ

ওরিয়েণ্ট লাইব্রেরী
১১৪ বি, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৬৫

প্রকাশক
শ্রীলাবণ্যময় দে
ওরিয়েণ্ট লাইব্রেরী
১১৪ বি, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

বাবা ও মা'কে

প্রকাশকের বক্তব্য

প্রত্যেক বাঙালী মায়েরই একজন খোকন থাকে।

আর খোকনদের থাকে মা।

সেই রকম একজন খোকনের চলে-যাওয়া মায়ের স্মৃতিচারণ "দূরের ভোর"।

এটি উপন্যাস নয়, নিছকই স্মৃতিচারণ।

আরও একটি কথা, এই বইটি হাতে লেখা নয়; টেপ-রেকর্ডারে ডিক্‌টেশান দেওয়া। টেপ থেকে সরাসরি লিখে দিয়েছেন আমাদের শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য। সে কারণে, তিনি লেখকের এবং আমাদেরও ধন্যবাদার্হ।

যেহেতু মুখে বলা হয়েছে, এতে পরাম্পরতা এবং সংলগ্নতা, কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। স্মৃতির পাতা থেকে যেমন যেমন ছবি মনে এসেছে লেখকের, তেমন তেমনিই বলে গেছেন তিনি।

ইচ্ছে করেই লেখক এই লেখা সম্পাদনা করেননি; কারণ, তাঁর মতে, এই অসংলগ্নতারও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

পাঠক-পাঠিকারা এই বই পড়বার সময় লেখা পড়ছেন একথা না ভেবে লেখকের মুখের কথাই শুনছেন ভেবে নিলে অসংলগ্নতার ভাব অনেকটা লাঘব হবে।

তোমার শোবার ঘরে একটা গড্‌রেজের আলমারী ছিলো। সে আলমারীর সামনে রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি আমায় পড়াতে বসাতে। তুমি বসতে আলমারীতে হেলান দিয়ে, আমি তোমার সামনে খালি গায়ে খাকি হাফ প্যান্ট পরে বসে পড়াশুনা করতাম।

পড়তে বসার আগে পার্কে গিয়ে ফুটবল খেলতাম গরমের দিনে। তারপর চৌবাচ্চা থেকে ঝপাঝপ্ করে গায়ে জল ঢেলে চান করে নিতাম। তুমিও তার আগে গা ধুয়ে নিতে। তোমার গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরোতো।

তোমার গায়ের গন্ধ আমার চিরদিনই বড় প্রিয় ছিলো। চান করে উঠে, তুমি বড় করে সিঁদুরের টিপ পড়তে কপালে। বাড়িতে কাচা, কিন্তু পরিষ্কার শাড়ি-জামা পরতে চানের পর; তারপর নিজে-হাতে বানানো এক কাপ চা খেতে। কখনো-সখনো আমি সেই চায়ের কাপের তলানিটুকু এক ঢোকে গিলে ফেলে তোমার কাছে বকুনি খেতাম।

তুমি যতদিন আমাকে পড়িয়েছিলে, আমি ততদিন সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম। তুমি যখন আর পড়াতে পারতে না, তখন পড়াশোনায় খারাপ হয়ে গেছিলাম।

ভবানীপুরের বাড়িটার কথা এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে আমার। বড় রাস্তা থেকে সরু গলি দিয়ে ভেতরে যেতে হতো অনেকখানি। সরু, মানে ভীষণ সরু; তাতে দুজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে অসুবিধা হতো। সেই গলি দিয়ে গিয়ে ডানদিকে দরজা ছিলো। সবুজ রং করা কাঠের দরজা। তাতে বাবার নাম লেখা ছিলো ঃ এম. এন. রায়।

সেটি ছিলো বাইরের ঘর। শুধু বসবার নয়, আমাদের বাড়িতে যে কাজের লোক ছিলো, রত্না, সেও শুতো কখনো-সখনো। সেই ঘরই ছিলো আমার পড়াশোনার ঘর, বাইরের লোকের বসবার ঘর; আরও অনেক কিছুর ঘর।

সেই ঘর পেরিয়ে এসে এক ফালি বারান্দা। সেই বারান্দার পাশে ছোট্ট একটু উঠোন মতো। উঠোনে নেমে ডানদিকে ছিলো পায়খানা। গ্রাম্য প্ল্যান ছিলো বাড়িটার।

সেই বারান্দার পাশে, বসবার ঘরের লাগোয়া শোবার ঘর, যে ঘরে সেই গড্‌রেজের আলমারী। আলমারীর সামনে একটু ফাঁকা জায়গা আর ঘর-জোড়া খাট। পুবে ছিলো দুটো বড় বড় জানালা আর জানালার সামনেই খাট; মানে তক্তপোষ। সেখানেই আগে আমি তোমার সঙ্গে শুতাম। বিনু ও মিনু, আমার দুই বোনও শুতো। আর তার পাশেই গড্‌রেজের আলমারীর উল্টোদিকে আর একটা খাট ছিলো। সেই খাটে বাবা শুতেন। আমি যখন বড় হয়ে গেলাম, বোনেরাও যখন আস্তে আস্তে বড় হলো, তখন আর ওই ভিতরের ঘরে শুতাম না। বাইরের ঘরে গিয়ে শুতাম ঠাকুমার সঙ্গে।

পথে পথে গ্যাসের বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে বসতে হতো। বেশ কিছুক্ষণ পড়াশোনা হওয়ার পর বাবা আসতেন অফিস থেকে। এসে ঐ ঘরেই খাটের উপর বসে জুতো খুলতেন, কোটটা খুলে হ্যাংগারে তুলে, দেয়ালের পেরেকে টানিয়ে রাখতেন। তারপর জামা-প্যান্ট খুলে, লুঙি-গামছা নিয়ে বাথরুমে যেতেন চান করতে।

বাথরুমটা ছিলো শোওয়ার ঘরের পাশে যে আরও একটা ঘর, সেই ঘর পেরিয়ে গিয়ে। সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে হতো। বাথরুমটা ছোট্ট। টিনের ছাদ-দেওয়া। টিনের দরজা। বড় একটা চৌবাচ্চা। বাথরুমের পাশেই ছিলো রান্নাঘর, রান্নাঘরের ভিত্ উঁচু ছিলো না। বর্ষাকালে রান্নার ঘর ভেসে যেতো জলে। নর্দমার জল ভরে যেতো রান্নাঘরে। রান্নাকরা জিনিসসমেত হাঁড়িকুড়ি বাসনপত্র সব ঘরময়

ভেসে বেড়াতো। তার মধ্যে সাঁতার কাটতো তেলাপোকা, ডুবে মরতো নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা।

এক বর্ষার রাতে আমরা যখন শোবার ঘরের পাশের ঘরে মেঝেয় বেতে-বোনা আসন পেতে বসে খাচ্ছিলাম, তখন এক কাণ্ড হয়েছিল খিচুড়ি রান্না হয়েছিল সেদিন। রান্না করেছিলো বুড়ো কেষ্ট। তার বাড়ি ছিলো উড়িষ্যাতে। বড় ভাল লোক ছিলো বুড়ো। চোখে বড় কম দেখতো, তার উপর ছিলো রাতকানা। কড়াইতে যখন আলু ভাজছে সে, আলুর সঙ্গে দুটো তেলাপোকাও ভাজা হয়ে গেছিল। কেষ্ট রাত্তিরে দেখতো না। দোষ ওর ছিলো না। দোষ তেলাপোকা দুটোরই। তারা আত্মহত্যা করবে বলে আলুর সঙ্গে কড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে না-পড়লে এমন কাণ্ডটা ঘটতো না।

আলুভাজার সঙ্গে খিচুড়ি মেখে খাচ্ছি, আলুভাজা মুখে পুরে দিতে কেমন যেন একটা নতুন নতুন স্বাদ মনে হলো। মুখের মধ্যে মচ্‌মচ্‌ করে উঠলো। সেই মচ্‌মচানিটা আলুভাজার মচ্‌মচানি একেবারেই থেকে অন্যরকম লাগলো। স্বাদটাও, বলা বাহুল্য ভিন্ন। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে আলু বের করে দেখি যে, আলু নয়, কড়কড়ে করে ভাজা তেলাপোকা।

যে ঘরে বসে আমরা খাচ্ছিলাম, সে ঘরটার চতুর্দিকে বাক্সের পর প্যাঁটরা, তার ওপরে বাক্স, তার ওপরে হাঁড়ি-কুড়ি, চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী সব কিছুই থাকতো। সেই ঘরেরই একটা কোণায় ছিলো ঠাকুমার ঠাকুরঘর। একটা কাঠের সিংহাসনে ঠাকুমার তেত্রিশ কোটি না-হলেও অন্তত পক্ষে তেত্রিশ জন ঠাকুর দেবতা সাজানো থাকতেন। অন্যপাশে ঠাকুমা তখন হবিষ্য রান্না করতেন। তুমি সব যোগাড় দিয়ে দিতে। ঠাকুমা তখন নিজেই রান্না করতেন এবং মাঝে মাঝে সে হবিষ্য রান্নার ভার তোমার উপরও পড়তো।

ঝক্‌ঝকে করে মাজা পেতলের হাঁড়ি, শ্বেত পাথরের থালা, লাল পাথরের গ্লাস, কালো পাথরের বাটিতে খেতেন। সবসময় ঐ

ঘরটা থেকে কেমন একটা সোঁদা সোঁদা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুতো। সে গন্ধটা একটা মিশ্র গন্ধ। চাল-ডাল, তেল-নুন, শুকনো লংকা, কালো-জিরে, গোল মরিচ এইসবের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকতো বাসি ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, বাতাসার গন্ধ, কদমার গন্ধ, নারকোলের গন্ধ, আর ঠাকুমার হবিষ্য রান্নার আতপ চাল এবং ঘিয়ের গন্ধ।

সেই ঘরটার পাশে একটা গলি ছিলো। সে গলিটা কানা গলি। সেই গলির মধ্যে ঐ তেতলা বাড়ির যত টুকিটাকি অপ্রয়োজনীয় জিনিস সব ফেলা হতো। আমরা কিছু ফেলতাম না। দোতলার ভাড়াটে ও তেতলার বাড়িওয়ালারা অনেক কিছুই সেখানে ফেলতেন। সেই ঘরের লাগোয়া যে বড় জানালাটা ছিলো, সেই জানালাটার তাকে বসে গরাদ দিয়ে আমি পাশের গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

দুপুর বেলায়, ছুটির দিনে অথবা গরমের ছুটির সময় যখন সারা বাড়ি নিঝুম, মধ্যের ঘরে মা, বোনেদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরে শুয়ে থাকতেন তখন আমি জানালার তাকে বসে সেই গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

কেউ আম খেয়ে আঁটি ফেলেছিল কখনও, সেই আঁটি থেকে গজিয়ে উঠেছে নতুন আমের চিকণ চারা। ফেলে-দেওয়া শিশি-বোতলের টুকরো, ভেঙ্গে যাওয়া, ব্যবহারে মলিন রঙিন চিরুনি, রিবন, কদবেলের খোসা, ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি, নানা ন্যাকড়া, নানারকম কাগজ, ঠোঙা, আরও কত কি। সেই বিচিত্র আবর্জনার মধ্যে নিস্তব্ধ গ্রীষ্ম দুপুরে একা একা চেয়ে থাকতে থাকতে যে কী সৌন্দর্য, কী শান্তি দেখতে পেতাম তখন, এখন সেকথা ভাবলেও অবাক লাগে।

ছোটবেলায় সব কিছুই এতো ভালো লাগত! চোখ তখন এতো অনাবিল ছিলো, মন তখন এতো সরল ছিলো, তখন পৃথিবীর এই কুটিল কুচক্রী আবর্ত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এতো কম থাকে যে, কাকের চেহারার মধ্যেও পরম সৌন্দর্য চোখে পড়ত তখন। বন্ধ গলির আবর্জনার মধ্যে আবিষ্কৃত হতো পরম ঐশ্বর্য।

খাঁ-খাঁ দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ করে চলে যাওয়া ট্রামের আওয়াজের মধ্যে দূরের রহস্যময় দিগন্ত সুপ্ত ছিলো তখন ; কল্পনা ছিল অবাধ, অবকাশ অনন্ত ; কত ছোটই ছিলাম তখন কিন্তু কল্পনার ঘোড়ার বল্‌গা ধরে বসে কোথায়-না-কোথায় যে চলে যেতাম, কেউই আমাকে বাধা দিত না। কেউই খবরদারী করতে আসত না। কোথাওই হারিয়ে যাওয়ার মানা ছিলো না তখন মনে মনে।

॥ ২ ॥

বাড়িওয়ালা মজুমদার বাবুরা তখন তেতলায় থাকতেন। দোতলায় থাকতো দীপালিরা। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ঘুঙুর পরে গান আর নাচ শিখতো তার মাষ্টারমশাইর কাছে। এখনও কানে আসে দীপালির গান, 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি, আমার মন কয় চিনি চিনি।'

একদিন রবিবার সকালে দীপালিদের বাড়িতে মাংস রান্না হচ্ছিল। আমাদের বাড়িতেও তুমি মাংস রাঁধতে কোনো কোনো রবিবারে। তবে মাংস তখন রোজ অথবা প্রায়ই হতো না। মাংসর গন্ধ আলুর গন্ধের সঙ্গে মিশে, গরম মশলার গন্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমস্ত বাড়িময় ম' ম' করত। জিভে জল আসত।

আমি সেদিন সকালে দোতলায় দিলিপ-দীপালিদের সঙ্গে খেলতে যাওয়ার সময় তোমাকে বলেছিলাম, কী সুন্দর মাংসর গন্ধ বেরোচ্ছে, না মা!

তুমি বলেছিলে, তোমাদেরও মাংস রেঁধে খাওয়াবো খোকন। তুমি যেন আবার ওদের কাছে মাংস খেতে চেয়ো না। মাংস ত খাওনা এমন নয়, তোমার স্বভাবটা এমন কেন?

এমন কথা সব মায়েরাই হয়ত সব ছেলেদের বলেন। শুধু এই কথার জন্যেই এ-কথার উল্লেখ করছি না। কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটা শালীনতা বোধ ছিলো, এমন সুন্দর অভিজাত শিক্ষা ছিলো তোমার মধ্যে যে, খুব কম দরিদ্র পরিবারেই আমি তা দেখেছি।

দরিদ্র বলাই ভালো। যদিও দারিদ্র্যকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বলে আমরা একটা গালভরা নামে ডেকে থাকি।

আমাদের পরিবারে বাবাই একমাত্র রোজগেরে লোক ছিলেন।

তখন তাঁর রোজগারও ছিলো যৎসামান্য। কাকারা তখনো কেউই নিজের পায়ে দাঁড়াননি। উত্তরবঙ্গে কিছু সম্পত্তি তখন ছিলো এবং তখনও দেশ ভাগও হয়নি। কিন্তু সে তো এজমালি সম্পত্তি এবং সেখানে কী রোজগার হতো, কী হতো না তা আমার জানার কথা ছিলো না এবং জানার ইচ্ছাও ছিলো না।

আমি যখন ছোট ছিলাম সেই ছোটবেলার অনেকখানি সময়েই যেভাবে তুমি সংসারকে টেনে নিয়ে গেছ এক শিশুর চোখের সামনে দিয়ে — সেই টানাটানির সংসারকে ধনীর সংসার বলে কখনো মনে হয়নি। দারিদ্র হয়তো ছিলো কিন্তু তোমার মনে কখনও কোনো দারিদ্র দেখিনি। তোমাকে দেখেই শিখেছিলাম যে, মানুষ ধনবান বা ধনহীন হতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের ধনী অথবা গরীব হয় মানুষ মনেই।

যদি কোনোদিন মনের ধনে ধনী হতে পারি, তবে একথা নিশ্চয়ই জানব যে, সে দান তোমারই দান।

তখন প্রতিমাসেই বাবাকে দেখেছি আমাদের বাড়ির যে চাকর, তার কাছ থেকে মাসের শেষে কুড়ি কি তিরিশ টাকা ধার নিতে। মাইনে পাওয়ার পর অবশ্য সে ধার বাবা শোধ করে দিতেন। বাবাকে দেখেছি ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস কম্‌পার্টমেণ্টে উঠে অফিসে যেতে। বাবাকে দেখেছি সাইকেল চড়েও অফিসে যেতে এবং অফিস থেকে ফিরে আসতে। এবং রবিবার সারা সকাল বসে সেই সাইকেলকে যত্ন করে ধুয়ে-মুছে তেল লাগাতে।

অতি সাধারণ ছিলো আমাদের জীবনযাত্রা। তাতে কোনো বাবুয়ানি ছিলো না।

কিন্তু তুমি বড় সৌখিন ছিলে মনে মনে। তুমি মাঝে মাঝেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে ঃ “আমার আর তো কোনো শখ নেই। একমাত্র শখ ছিলো ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ভালো জামাকাপড় পরাবো, যখন বাইরে যাবে আমার সঙ্গে, তখন সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে যাবো। সে শখটুকুও পূরণ হলো না।”

বাবা চিরদিনই খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ ছিলেন। তিনি কখনও তোমার মনের এই দিকটার খোঁজ রাখেননি। খোঁজ রাখলেও তার দাম দেওয়া বাস্তব কারণে প্রয়োজন মনে করেননি। হয়তো তা অসম্ভবও ছিলো। অবশ্য এই বাবাই তোমাকে সমস্তরকম পার্থিব সুখ দিয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে।

আজকে তুমি নেই; থাকলে জিজ্ঞেস করে জানতে পারতাম হয়তো যে, তুমি কী সত্যিই তোমার যা কিছু চাওয়ার ছিলো, সবই পেয়েছিলে? টাকা হলেই কি মানুষ সুখী হয়? বড় বাড়িতে থাকলে, গাড়িতে চড়লেই কি মানুষ সমস্ত অপ্রাপ্তির হাত থেকে বেঁচে যায়?

সে কথার উত্তর আজকে আর পাওয়ার উপায় নেই। তবে আমি যখন আরও বড় হয়েছি, যখন কলেজে পড়ি, তুমি প্রায়ই বলতে, সব স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই মনোমালিন্য বাদানুবাদ হয়, কিন্তু বাবা যেমন ঝগড়া-ঝাঁটি করেন তোমার সঙ্গে, তেমন ভালোও বাসতে জানেন। বাবার মতো ভালো নাকি কম লোকই বাসতে জানেন।

এ-কথা বাবা জানেন কি-না জানি না। তুমি হয়তো এ-কথা বাবাকে কোনোদিন বলোনি। আজ তুমি নেই বলে তোমার মুখের কথা মনে পড়ছে।

তুমি ছোটবেলায় বিহারের এক সুন্দর ছোট্ট শহরে মানুষ হয়েছিলে। শালবন, উশ্রী নদী, খাণ্ডুলী পাহাড় এই সমস্তর স্মৃতি তোমার চোখে আঁকা ছিলো। তুমি ছিলে জন্ম-রোম্যান্টিক। কোনো বর্ষার দিনে, কি কোনো চাঁদনী রাতে তোমার মধ্যের এই রোম্যান্টিক মানুষটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো।

কত কষ্ট ছিলো তোমার, সব কষ্ট বোঝার মতো আমার বুদ্ধি ও মানসিকতা ছিলো না। কিন্তু কোনো কষ্টই তোমার উচ্ছল, সৌন্দর্য-পিপাসু প্রকৃতি-পাগল মনটাকে একটুও বিকৃত করতে পারতো না। কোনোদিনই পারেনি। এবং আমি যদি তোমার কাছ থেকে কিছুমাত্র গুণ পেয়ে থাকি, তা বোধহয় তোমার ঐ সৌন্দর্য-পিপাসা।

তোমার এই কবি-কবি ভাবের জন্যে বাবা তোমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করতেন। তুমি হাসতে। কখনও ঝগড়া করোনি বাবার সঙ্গে। ঝগড়া বলতে যা বোঝায়। বাবা আর তোমার মধ্যে মিল বলতে এটুকুই ছিলো যে, তোমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতে এবং ভালোমানুষ ছিলে। কিন্তু অন্য অনেক ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কোনো মিল ছিলো না। তবে সে অমিল এমন নয় যে, সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরায়।

অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সেযুগে মেয়েদের কোনোরকম স্বাধীনতা ছিলো না। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা তো নয়ই। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাও খুব কম নারীর ছিলো, যদিও তুমি শিক্ষিত ছিলে। তবুও তখনও স্ত্রীদের কাছে পতিমাত্রই পরমগুরু বলে পরিগণিত হতেন।

তবে বাবাকে তুমি নিছক পতি বলেই শ্রদ্ধা করোনি, একজন পুরুষের মধ্যে যেসব গুণ থাকলে একজন নারীর শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া যায় বাবার মধ্যে সেইসব গুণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলো। বাবা ছিলেন পৌরুষের সংজ্ঞা। কাজের ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, পুরুষালি জেদ, সাহস, আত্ম-নির্ভরতা, মর্যাদাবোধ এ-সমস্তই তাঁর মধ্যে প্রবল মাত্রায় ছিলো। আর তোমার মধ্যে ছিলো চিরাচরিত ভারতীয় নমনীয় নারীর সুন্দর স্নিগ্ধ পরনির্ভরতা। পরের উপর পরনির্ভরশীল অনেকেই হয়তো হয়, কিন্তু পরনির্ভরতা যে একটা উঁচুদরের আর্ট, তা একমাত্র আমাদের দেশের মেয়েরাই জানে।

তোমাকে দেখে অন্তত এ-কথা আমার চিরদিনই মনে হয়েছে।

তুমি মানুষ হয়েছিলে ব্রাহ্ম পরিবেশে। যে-পরিবেশে কথা বলার সময় দাঁত দেখানো, হাসবার সময় মুখ বড় করে হাসা, উঁচু গলায় কথা বলা বারণ। আরও অনেক ব্যাপারে তখনকার দিনে ব্রাহ্ম প্রভাব অনেকানেক শিক্ষিত বাঙালী পরিবারে বেশ বেশীমাত্রায় পড়েছিল।

আমার পিতৃপরিবার কিন্তু হিন্দু ছিলেন। শুধু হিন্দু বললে পুরোপুরি বোধহয় ঠিক বলা হয় না। “অব্রাহ্ম” বলাটাই ভালো।

সে কারণে খুবই বুঝতে পারতাম যে, তোমার পক্ষে বহুদিন পর্যন্ত এই অব্রাহ্ম পরিবেশ মানিয়ে নেওয়া বড় কষ্টকর হতো। কিন্তু তোমাকে দেখেই শিখেছি, যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য ও নিজের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে কিভাবে বজায় রাখা যায়।

তোমার নিজের কাছে যে মানুষটি ছিলে তুমি, অথবা তোমার প্রিয় ছেলে মেয়ের কাছে, সে-তুমি ছিলে অন্য মানুষ। সে মানুষের মানসিকতায় সংসারের গ্লানি, রৌরব, একঘেয়েমি কোনো ছাপই রাখতে পারতো না। তোমার আত্মার উজ্জ্বল স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দে তুমি সবসময় ঝিক্‌মিক্‌ করতে। তোমার প্রকৃত অন্তরঙ্গ রূপ আমি জেনেছিলাম আমার হৃদয়ে ; অতি অল্প বয়সেই।

আমি আম খেতে খুব ভালোবাসতাম। তুমিও। বাবার এক জ্ঞাতি কাকা, বড়িশালের মানুষ তিনি ; মাঝে মাঝেই ধূমকেতুর মতো উদয় হতেন আমাদের বাড়িতে। বাবার কাকা বলেই মা তাঁকে পরম যত্নে আপ্যায়ন করতেন এবং আমাদেরও শিক্ষা দিতেন তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে।

তখন খুবই ছোট ছিলাম। তবুও আজ এতো বছর পরে যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় যে, শ্রদ্ধা বা ভক্তি এমনই জিনিস যে তাকে জোর করে আদায় করা যায় না।

বরিশালের দাদু হাতে করে কোনোদিন খুব বড় একটা ফজলি আম নিয়ে আসতেন। কোনোদিন-বা চারটে ভারী ভালো ল্যাংড়া। সেই আমের গন্ধে বাড়ি ভরে যেতো। কখনও কখনও বা তিনি জলযোগ থেকে দই রসগোল্লা নিয়ে আসতেন। এনে বলতেন, বউমা, আমার খাওয়ার সময় আমাকে দিও। মা যখন এতোখানি ঘোমটা টেনে বসে সেই আম বটিতে কাটতেন, আমি বঁটির সামনে চুপ করে বসে দেখতাম।

খাওয়ার ব্যাপারে আমি ছোটবেলা থেকেই বড় লোভী ছিলাম। এখনও হয়তো আছি। জানি না। লোভী লোকেরা সচরাচর স্বীকার করে

না তাদের লোভের কথা। খাওয়া ছাড়াও অন্য লোভের কথাও।

মা যখন আম কাটতেন, আমি সামনে বসে থাকতাম। মা হাসতে হাসতে আমাকে বলতেন, খোকন লোভ দিও না।

আমি বলতাম, না মা।

তারপর বলতেন, বাবুকে বলবো একদিন তোদের অনেক আম এনে দেবেন, কেমন?

আমি বলতাম, হ্যাঁ মা।

তারপর দেখতাম, বঁটিতে আম কাটতে কাটতে মার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মা সেই আম সুন্দর করে সাজিয়ে দাদুকে খেতে দিতেন। দাদু পরম প্রীতির সঙ্গে সেই আম খেতেন।

শুধু আম নয়, দাদু যাই-ই আনতেন হাতে করে, বলতেন, বউমা আমাকে খাওয়ার সময় দিও। মা তাই দিতেন।

শিশু মনে শ্রদ্ধা বা ভক্তি আপনা থেকেই উদয় হয় না। আমার পক্ষে যেহেতু সেই স্বার্থপর বৃদ্ধ, আমার বাবার গুরুজন, সেই একমাত্র কারণবশেই আমার পক্ষে সেই মানুষকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব হতো না।

আমি হয়তো লোভী ছিলাম। কিন্তু সেই শিশুর লোভের পরিপ্রেক্ষিতে একজন বৃদ্ধর চক্ষুলজ্জাহীন লোভের কোনো তুলনাই ছিলো না।

কখনও তুমি বলো নি, অন্য কারো কোনো দোষের, কারো কোনো অন্যায়ের কথা। তুমি চিরদিন আমাদেরই শাসন করেছিলে।

সংসারে কিছু কিছু মানুষ থাকে, যাদের কপালে আদর লেখা নেই। আদরের ভাগ্য তারা করে আসেনি, হয়তো আমি সেই শ্রেণীর লোক। কিন্তু তুমিই শিখিয়েছিলে যে, আদর পাওয়ার চেয়ে আদর করা অনেক বড়। আদর খেতে সকলেই জানে, আদর ছিনিয়ে নিতেও জানে অনেকে। কিন্তু অন্যমানুষকে নিঃশর্তভাবে শুধু হৃদয়ের আনন্দের জন্যই আদর কী করে করতে হয় সেকথা খুব কম মানুষই জানে।

আমাদের বাড়ির পেছনে যে ছোট্ট বাগানের কথা বলেছিলাম

বাথরুমের পাশে, সেটি লম্বা-চওড়ায় বোধহয় পনেরো ফিট বাই তিরিশ ফিট ছিলো। কিন্তু যেহেতু আমি নিজে অত্যন্ত ছোট ছিলাম, আমার পদক্ষেপ ছিলো সংক্ষিপ্ত, আমার উচ্চতা ছিলো কম, আমার চোখে সেই বাগানকে মনে হতো এক বিরাট অরণ্য। সেই বাগানের মধ্যে ছুটির দিনে সারা দুপুর নদী বানাতাম, পাহাড় সাজাতাম, বাথরুম থেকে মগে করে জল এনে সেই নদীতে বান বওয়াতাম। ছোট ছোট ঘাসকে বড় বড় বনস্পতি কল্পনা করে গভীর ছায়াচ্ছন্ন নির্জন অরণ্যের দুপুরে ভয় ও আনন্দের আলোছায়ায় আমি একা একা অ্যাডভেঞ্চার করতাম।

রথের মেলা থেকে একটি করবী গাছের চারা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন সেজকাকু। রক্তকরবী। সেই চারাটি লাগানো ছিলো বাগানের খিড়কি দরজার পাশে। দেখতে দেখতে চারাটি বড় হয়ে পাতায় ফুলে ভরে গেছিল।

বাগানটার দেয়ালের পিছনে ছিলো এক প্রকাণ্ড মাঠ। প্রকাণ্ডতর মনে হতো শিশুর চোখে। রাতভর বৃষ্টির পর সেই মাঠ জলে থৈ-থৈ করতো। আর কোথা থেকে কী জানি শ'য়ে শ'য়ে হলুদ সোনা-ব্যাঙ এসে ভোরবেলা থেকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকাডাকি কবতো, ঐ মাঠেই শীতকালে একপাল ভেড়া এনে ভেড়াঅলা তাদের হাত-পা বেঁধে শুইয়ে ফেলে লোম কাটতো।

কোলকাতার একেবারে বুকের মধ্যেও তখনও এমন এমন অনেক নির্জন জায়গা ছিলো। তখন এমন অনেক কিছুই ছিলো শিশুদের অনাবিল আকর্ষণের এই হৃদয়হীন গা-ঘিন্‌ঘিন্ ভীড়ের এই শহরে। অনেক গাছ ছিলো, পাখি ছিলো, পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকা জমি ছিলো, রোদ ও মেঘের খেলা ছিলো, নিস্তব্ধ দুপুরে একটা ট্রামের আওয়াজ ছিলো, সকাল বিকেল করপোরেশনের লোকের পাইপে করে ফট্‌ফট্ শব্দ করে রাস্তা ধোওয়া ছিলো। আজকের মতো আবর্জনার স্তূপে-ভরা নোংরা, শ্রীহীন দোকানময় ফুটপাথে মোড়া ছিলো না কলকাতা।

বিকেলের দিকে যখন আলো পড়ে আসতো তখন সেই মাঠের এক

কোণায় দাঁড়ানো নিমগাছটার চতুর্দিকে চাতক পাখিরা 'ফটিক জল', 'ফটিক জল' বলে, চাবুকের মতো ডাক ডেকে ঘুরে ঘুরে উড়তো। সেই মাঠের এক কোণায় একটা শিমুল তুলোর গাছ ছিলো। ঋতুতে ফুল ফেটে সেই তুলো ছোট্ট ছোট্ট গোলমরিচের মতো কালো বীজের সঙ্গে আলতো হয়ে হাঁসের বুকের পালকের মতো নরম রেশমী শরীরে হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নাচতে নাচতে কোথায় না কোথায় চলে যেতো। শিশুমনে সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সামান্যতারও এক বিরাট ভূমিকা ছিলো।

ছুটির দিনের দুপুরে তুমি খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের নিয়ে শুতে, কোনোদিন বা রাজকাহিনী পড়ে শোনাতে। অবন ঠাকুরের রাজ-কাহিনী। হাম্বীরের গল্প, চণ্ডের গল্প, গোহোর গল্প, আরও কতসব গল্প। আরো অনেকানেক বই। আঙ্কল টমস্ কেবিন। রবি ঠাকুরের বই।

তোমার সুললিত কণ্ঠস্বরে যেসব গল্প একদিন তোমার মুখে শুনে-ছিলাম, সেই সমস্ত গল্প চিত্রকল্প হয়ে আমার চোখে আঁকা আছে। সেই চিত্রকল্পের জগৎ থেকে ছুটি হবে তখনই, যখন আমার এ-চোখ চিতায় পুড়ে ছাই হবে।

বাইরের ঘরে গোপীকাকু ও চানুকাকুও থাকতেন। রাতে মেঝেতে ঢালা বিছানা করে, ঠাকুমা, আমি, ছোটকাকু, আর ওঁরা দুজনেও শুতাম। গোপীকাকু কোথায় যেন কাজ করতেন। খিদিরপুরে না কোথায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমস্ত ঋতুতে ভোর চারটেয় তিনি উঠতেন, উঠে চান করে নিয়ে ছোট্ট টিফিনের বাটিতে হাতে-গড়া আটার রুটি এবং আলুর তরকারী নিয়ে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে যেতেন কাজে। ফিরতেন সেই সন্ধ্যেবেলায়।

তুমিও প্রায় সেই সময়ই উঠতে। সেই সময় থেকেই শুরু হতো তোমার দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যৌথ পরিবারের তাবৎ কর্তব্য-কর্ম হাসিমুখে সম্পন্ন করতে তুমি। সেযুগে পূর্ববঙ্গীয় পরিবারমাত্রই এমনভাবে যৌথ ছিলো যে, সেরকম পরিবার আজকাল আর চোখে পড়ে না। বসবাস খাওয়া-দাওয়ার

যৌথতা ছাড়াও অতিথি আগন্তুকের কমতি ছিলো না। তখন এদেশীয় জীবনযাত্রা বড়ই মন্থর ছিলো। মানুষ মাত্রই খুব অল্পে সন্তুষ্ট ছিলো। মানুষ হয়তো অপেক্ষাকৃত অলসও ছিলো। প্রত্যেকেরই বোধহয় হাতে অবকাশ ছিলো প্রচুর। জাগতিক ব্যাপারে উচ্চাশাও বোধহয় এখনকার মতো সর্বগ্রাসী ছিলো না।

আমরা অত কষ্টে থাকতাম, অত অল্প জায়গায়, অত লোকের মধ্যে, অত অসুবিধার মধ্যে, কিন্তু তবুও যে-কোনো সময়েই কোনো অতিথি বাড়িতে এলে তাঁকে না-খাইয়ে ছাড়া হতো না। খাওয়া মানে, পোলাও মাংস নয়, যাই-ই রান্না হতো, তাই-ই তাঁরাও দু মুঠো খেয়ে যেতেন আমাদের সঙ্গে।

এই সমস্ত রেওয়াজের যেমন ভালো একটা দিক ছিলো, তেমন খারাপ দিকও ছিলো। ভালো দিক বলতে, শিশুবেলা থেকেই ঐ পরিবেশে আমরা অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তা থেকে কিছু শিখি আর নাই-ই শিখি। সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকা দেখেছিলাম।

কিন্তু খারাপ দিকের মধ্যে ছিলো বহু দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব আমাদের সেই ছোট্ট বাসাবাড়িকে কোলকাতার বিনি-পয়সার অতিথিশালা বলে মনে করতেন। এমন অনেক অনেক লোকের মুখ এখনও চোখে ভাসে, যাঁদের পরবর্তী জীবনে কখনো দেখিনি, কখনো কাছে পাইনি আমাদের কোনো বিপদে বা আপদে।

সমস্ত সময় এমন গোলমাল, আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া আমার ভালো লাগতে না। একটুও একা থাকা মুশকিল ছিলো। খাওয়া ব্যাপারটা পূর্ববঙ্গীয় সমস্ত মানুষের কাছেই একটা অবসেশান। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, কারো হৃদয়ে পৌঁছবার একমাত্র পথই হচ্ছে পেটের মধ্যে দিয়ে। কাউকে খাইয়ে যতখানি আদর করা যায়, আর কিছু করেই অতখানি আদর করা যায় না।

সমস্ত যৌথ পরিবারে যা অমোঘ, আমাদের পরিবারেও সেই অমোঘতা বিদ্যমান ছিলো। পরিবারে যে মানুষটি করে, তাকে একাই সব করতে

হতো। ঘরে মাকে ; বাইরে বাবাকে। যে বোঝা বয়, সে চিরদিনই বোঝা বইতো। আর অন্য অনেকেই গায়ে হাওয়া দিয়ে, পরনিন্দা পরচর্চা করে এবং আরো অনেকানেক সখের পিছনে সময় এবং জীবন কাটিয়ে তাঁদের যে কারো প্রতি কিছুমাত্র কর্তব্য ছিলো এ-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দিব্যি খোশমেজাজে বিবেকরহিত হয়ে থাকতেন।

বেশীর ভাগ নির্ধন যৌথ-পরিবারেই এই নিয়ম চলে এসেছে। চিরদিন। যৌথ-পরিবারের অনেকানেক ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও যে আজ যৌথ-পরিবার বিরল হয়ে এসেছে তার এইটে একটা বড় কারণ।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত যৌথ-পরিবারে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, শিশুরা বড় অবহেলিত হয়। তাদের কোনো নির্জনতা থাকে না, তাদের পড়ার জায়গা, তাদের সুবিধা-অসুবিধা, তাদের মানসিকতা সম্বন্ধে বাড়ির বড়দের সকলেরই নিদারুণ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

তা নিঃসন্দেহে সমালোচনার। এবং হয়ত নিন্দারও।

॥ ৩ ॥

মা গো, তোমার কথা বলতে বসে কত কী অবান্তর কথা মনে আসছে!

কিন্তু এ-সমস্তই তোমার স্মৃতি ঘিরে। তুমি ছিলে বলেই এই সমস্ত কিছুর অবতারণা আজ। তোমাকে সারাদিনে খুব. বেশী কাছে পেতাম না। কিন্তু তবুও যখন পেতাম, তোমার স্নিগ্ধ, সুন্দর, উজ্জ্বল সান্নিধ্য আমার মনে, আমার শরীরে এমন এক প্রলেপ লাগতো যে, তা আজও অন্তরে, শরীরে অনুভব করি।

জ্বরের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে যখন পড়ে থাকতাম; যখন তুমি কপালে তোমার নরম হাত রাখতে, তখন মনে হতো বুঝি সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেলো। অসুখ করলে, সে যে বয়সেই হোক না কেন, তুমি চিরদিন আমাকে কাছে টেনে নিতে, তোমার কাছে রাখতে। যখন অনেক বড় হয়েছিলাম, তখনও আমার অসুখে তুমি এসে সবসময় আমাকে দেখাশোনা করতে।

মায়ের হাতের পরশ, যে আরোগ্যবাণী নিয়ে আসে সন্তানের মনে, সে-বাণী যে আর কারো পক্ষেই পৌঁছনো সম্ভব নয়।

যখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, তখনও পরীক্ষা দেবার সময় খুব নার্ভাস হয়ে পড়তাম। অন্য কোনো ব্যাপারে নার্ভাস ছিলাম না, অথচ পরীক্ষার সময়ে কেন যে নার্ভাস হতাম, সেটা আজও বুঝে উঠতে পারি না। পরীক্ষার প্রস্তুতি যে থাকতো না তা নয়, কিন্তু পরীক্ষাতে যেমন ফল করবো ভাবতাম, তেমন ফল করা কখনোই সম্ভব হতো না। কারণ ঠিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়টাতে চিরদিনই অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হয়ে পড়তাম। সেই সময় প্রত্যেকদিন পরীক্ষার শেষে আমাকে

তোমার ঘরে নিয়ে আসতে তুমি। মনে আছে, গরম জলে বায়োকেমিক ওষুধ কালিফস্ গুলে তুমি আমাকে খাওয়াতে। যতদিন পরীক্ষা চলতো ততদিনই আমি রাতে তোমার ঘরে শুয়ে থাকতাম।

মা, আজকে আমার জীবনে রোজই পরীক্ষা। শুধু আমার কেন, হয়তো প্রত্যেকের জীবনেই। যে পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানিক, যে পরীক্ষা স্কুল-কলেজের অথবা ইউনিভার্সিটির, সে পরীক্ষা যে জীবনের সহজতম পরীক্ষা, তা প্রত্যেক মানুষই শুধুমাত্র বড় হবার পরই বুঝতে পারে।

এখন সকাল থেকে রাত অবধিই পরীক্ষা। যৌবনের পরীক্ষা, প্রেমের পরীক্ষা, বিরহের পরীক্ষা, বিশ্বাসের পরীক্ষা, পুত্রের পরীক্ষা, পিতার পরীক্ষা, স্বামীর পরীক্ষা, স্ত্রীর পরীক্ষা, সম্পর্কর পরীক্ষা, বন্ধুত্বের পরীক্ষা, জীবিকার পরীক্ষা, সততার পরীক্ষা, প্রৌঢ়ত্বের পরীক্ষা, বার্দ্ধক্যের পরীক্ষা, পরীক্ষার পর পরীক্ষা।

আজকে তুমি নেই। গরম জলের সঙ্গে কালিফস্ গুলে আমাকে আর কেউ খাওয়ায় না। অথচ তবুও কোনো পরীক্ষাতেই পিছপা হওয়া যায় না বেঁচে থাকবার কারণে। তুমি ছাড়াই সমস্ত পরীক্ষায় বসতে হয়, পাস অথবা ফেল করতে হয়। কিন্তু আজকে পরীক্ষা পাস করলে, জীবনের স্কুল থেকে নিত্য নতুন সাফল্যর রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলে, কারো মুখই আনন্দে তোমার মুখের মতো আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। কেউ আমাকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে, গর্বে, ফুলে উঠে আর বলে না, খোকন, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না! বলতে পারছি না।

এখনও পরিষ্কার মনে আছে, বাবা একবার আমাদের পুজোর সময় বিন্ধ্যাচলে নিয়ে গেছিলেন। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর শহর থেকে মাইল তিন-চার দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম। তার নাম শিউপুরা।

পাথরের বাড়ি কয়েকটি ছোট ছোট, মধ্যে দিয়ে ফাঁকা রাস্তা চলে গেছে। সে-রাস্তার বুক চিরে চলে গেছে রেল লাইন এলাহাবাদের দিকে। বাঁদিকে বেনারস। শিউপুরার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা-মাঈ। সারাদিন সেই নদীর উপর ঘুরে ঘুরে চখাচখি ওড়ে। নদীর

ঘাটে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ, কী স্নিগ্ধ ছায়া তার।

তুমি কিন্তু কখনও নদীতে চান করতে যেতে না। জলে তোমার বড় ভয় ছিলো। একবার পুরীতে গিয়ে বাবা আমাদের বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে সমুদ্রে একটা ডুব দেওয়াতে পারি, তাহলে তিনি দশ টাকা দেবেন। তখনকার দিনে দশ টাকার প্রলোভনটা নিতান্ত কম ছিলো না। কিন্তু আমাদের সকলকেই সেদিন ব্যর্থ হতে হয়েছিল। তুমি পায়ের পাতাটুকু খালি ভিজিয়েছিলে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ে। তার বেশী ভিতরে তোমাকে আর কারো পক্ষেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

বিন্ধ্যাচলের কথা বলছিলাম। সেই ছোট্ট ঘুমন্ত শিউপুরা গ্রাম ছাড়িয়ে কাঁচা পাথুরে একটা পথ পিচের রাস্তাকে সমকোণে কেটেছিল। সেই বড় রাস্তাটা রেললাইনের সমান্তরালে চলে গেছে। টান টান হয়ে রেললাইন শুয়ে আছে একটা বিরাট কালো, চকচকে সাপের মতো। তার মুখ রয়েছে এলাহাবাদে আর লেজ রয়েছে বারাণসীতে। কাঁচা রাস্তাটা শিউপুরা থেকে এসে উঠে গেছে বিন্ধ্যপাহাড়ের ওপরে।

পাহাড়ের উপরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সেই মন্দিরে উঠতে হয়, দু'পাশে ছোট-খাট দু-একটি দোকান পাণ্ডাদের। ক্ষীরের মেঠাই তৈরি করে পাণ্ডারা, বহু দূর দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে পুজো দিয়ে যান। পথের দু'পাশে জঙ্গল ঘন হয়ে থাকে। পবন নন্দনের দল হুপ্-হাপ্ শব্দ করে জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে মথিত করে। কিন্তু বড় শান্তির পথ ছিলো বিন্ধ্যবাসিনীর পথ।

তোমার ভগবানকে কোনোদিন তুমি দেখেছিলে কি না জানি না আমি। কিন্তু বিপদে, আনন্দে, নির্জনতায়, কোলাহলে তাঁর অস্তিত্ব হৃদয়ে অনুভব করাতে শিখিয়েছিলে আমায়।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে যেতাম বিকেল বেলায়। সেই নির্জন পাহাড়ী বনপথ দিয়ে। যখন ময়ূর ডাকতো এপাশ-ওপাশ থেকে কেয়া

কেয়া কেয়া রবে, যখন কত না কত পাখি সন্ধ্যার আরতি জানাতো বিন্ধ্যবাসিনীকে, তখন একটি মুগ্ধ শিশু তার সুন্দরী মায়ের নরম হাতে হাত রেখে ভগবান দর্শনে যেতো প্রতিদিন।

আমি কিন্তু কোনোদিনও মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি। মন্দিরের ভিতরে ঢুকলে আমার কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। আমি বলতাম, আমি বাইরে আছি, তুমি পুজো দিয়ে এসো। আশ্চর্য, তুমি কোনো-দিনও আমাকে জোর করোনি। চিরদিন বলেছ, আচ্ছা তুই বোস, আমি আসছি। পরবর্তী জীবনে তোমাকে দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতাম, যখন তুমি যেতে চাইতে। তখনও আমি চত্বরে বসে থাকতাম, তুমি ভিতরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে।

ভগবানে ভক্তি ছিলো তোমার অগাধ। সেই ভক্তি তুমি পেয়েছিলে তোমার মায়ের কাছ থেকে, তোমার মামা বাড়ির কাছ থেকে। তুমি বড় নরম ছিলে। রক্ত দেখতে পারতে না তুমি। বাবা যখন পাখি মেরে আনতেন শিকার করে, অথবা হরিণ মেরে আনতেন, শম্বর মেরে আনতেন, আঁতকে উঠতে তুমি সেই রক্তাক্ত পশুপাখি দেখে। কিন্তু কখনও তুমি তা রান্না করে দিতে অস্বীকার করোনি। কারণ তোমার স্বামীর শখে তুমি কখনও বাধা দাও নি। কিন্তু মনে মনে তুমি যে এটা পছন্দ করতে না, আমরা সকলেই বুঝতে পেতাম।

॥ ৪ ॥

বাবার খুব শিকারের শখ ছিলো।

পরবর্তী জীবনে বাবা প্রায়ই শিকারে যেতেন। শিকার সম্বন্ধে তোমার বিরূপতা বাবার এবং বাবার বন্ধুবান্ধবদের কাছে, যাঁদের সঙ্গে বাবা শিকারে যেতেন, তাঁদের সকলের কাছে এক হাসির ব্যাপার ছিলো। যদি কোনোদিন শিকারে গিয়ে শিকার না পাওয়া যেতো, তাহলে বাবার বন্ধুরা বলতেন, কি করে হবে শিকার? বাড়িতে যা "হাই ভোল্‌টেজ রেসিস্‌ট্যাণ্টস্‌", শিকারের দোষ কি?

এই কথা নিয়ে আমরাও অনেকদিন হাসাহাসি করেছি, তোমাকে ক্ষেপিয়েছি।

কিন্তু তুমি কেবলই হাসতে আর বলতে, বুঝবি, বুঝবি, এমন করে এই পাখি আর জন্তুদের মারিস, ভগবান যে একদিন কি শাস্তি দেবেন তোদের, আমি খালি সেই কথা ভেবে আঁতকে উঠি।

বিন্ধ্যাচলে আমি সারাদিন পাহাড়ের উপরে, মালভূমিতে একা একা হেঁটে বেড়াতাম। বন্দুক নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম। শিকারটা ছিলো একটা ছুতোমাত্র। সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেই আদিগন্ত মালভূমি, সেই নীল আকাশ, সেই আমলকিতলায় চরে-বেড়ানো চিতল হরিণের দল, গঙ্গার উপরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওড়া বাদামী চখা-চখির ঝাঁক আর অনেক নীচে সমতলে ধুঁয়ো-উড়িয়ে চলে-যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সর মতো রেলগাড়ি—এই সব সুদূর গোধূলীর আশ্চর্য সুন্দর ছবিগুলি এখনও চোখে ভাসে।

তুমি বলতে, ভগবান কিন্তু মন্দিরে থাকেন না। মাঝে মাঝে মন্দিরে আসেন। ভগবান থাকেন আকাশে-বাতাসে, রোদে-বৃষ্টিতে,

হাওয়ায়-মাটিতে, আমাদের নিঃশ্বাসে। ভগবানকে যে বুঝতে চায়, যে হৃদয়ে অনুভব করতে চায়, সে সব সময় তা করতে পারে।

ভগবান কাকে বলে আমি জানতাম না, আজও জানি না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের মুখে মুখে বিন্ধ্যাচলের মালভূমির ওপর দিয়ে যখন ফিরে আসতাম যখন শেষ সূর্যের সোনা আলো নরম আলতো আঙুলে সমস্ত মালভূমির শায়িত শরীরকে ছুঁতো, সমস্ত-মালভূমির গাছ-গাছালি শেষ সূর্যের স্পর্শে ধন্য হতো, যখন ওম্-ধরা বুকের ক্ষয়েরী তিতিররা কী এক চমক্তোলা তীক্ষ্ণ ডাক ডেকে তাদের উড়ে যাওয়ার সরল তীক্ষ্ণ ছন্দে অপসৃয়মাণ স্তিমিত সূর্যকে ধাওয়া করে তীরবেগে ছুটে যেতো, তখন আমার মনে হতো ভগবান বোধহয় এ রকম জায়গাতেই থাকেন।

সেই পথের পাশে যখন টি-টি পাখিরা তাদের লম্বা লম্বা উড্ডীন পা নিয়ে পাগলের মতো দল বেঁধে চীৎকার করতো, যখন পাহাড়ের গুহাতে বসে পাশে কমণ্ডলু রেখে নাগা সন্ন্যাসী সামনে ধুনী জ্বালিয়ে ভগবানের নাম গাইতেন, যখন সেই আসন্ন সন্ধ্যার হিমহিম রহস্যময় পরিবেশে দিগন্তের কাছে এক ঝাঁক কৃষ্ণসার হরিণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতো গাছ-গাছালির ধূলিমলিন ধূসর সবুজ আঁচলে, যখন মালভূমি থেকে ফুল-পাতা, ঝোপ-ঝাড়, পাহাড় আর পাখির আর সুন্দরী পৃথিবীর গায়ের গন্ধ মিশে এক আশ্চর্য শান্ত স্নিগ্ধ মিশ্র গন্ধ বেরোতো, তখন মনে হতো ভগবান বোধহয় এখানেই থাকেন।

অথবা, যেদিন সূর্য ওঠার আগে স্নিগ্ধ, সিক্ত মালভূমি পেরিয়ে নীচের উপত্যকাতে নেমে যেতাম, যখন কচি-কলাপাতা সবুজ ছোট ছোট টিলা ছাওয়া উপত্যকাতে শিশির পড়ে থাকতো রূপোলী চাদরের মতো, যখন সেই সবুজ রূপোলী সিক্ত গালচেয় ধূসর-নীল গাইয়ের দল দৌড়া-দৌড়ি করে খেলে বেড়াতো, যখন প্রথম সূর্যের আলো পড়ে সেই ধাবমান নীল গাইয়ের দলের ক্ষুরে ক্ষুরে ছিট্কে-ওঠা শিশিরে লক্ষ লক্ষ হীরে চমকাতো অথবা যখন রাতভর বজরা-ক্ষেত পাহারা দেওয়া গাঁওয়ার

ছেলে বাঁশী বাজিয়ে পাহাড়তলীর গাঁয়ে ফিরতো ভোরের বেলায়, সেই বাঁশীর সুরের আবেশে এবং সেই নির্জন আদিগন্ত শান্তিস্বরূপ প্রকৃতিতে ছ'চোখ ভরে গেলে মনে হতো বোধহয় ভগবান এখানেই থাকেন।

ভগবানকে দেখার চোখ, অনুভব করার চোখ, তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।

॥ ৫ ॥

আমাদের কলকাতার বিশেষ বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ আনন্দের ঝলক নিয়ে আসতেন ছোট মামা। তুমি যদি রোমান্টিক ছিলে, তাহলে ছোট মামাকে কী বলে ব্যাখ্যা করবো জানি না। রোম্যান্টিসিজ্‌ম ছিলো তাঁর প্রতি রক্ত কণিকায়। এত মাত্রায়ই তা ছিলো যে, জীবনের বাস্তবতার মুখ সেই রোম্যান্টিসিজমের পর্দা ভেদ করে কোনোদিনও আমৃত্যু তাঁর পক্ষে দেখে ওঠা সম্ভব হয়নি। ছোট মামার মতো সরল শিশুসুলভ দেবদুর্লভ মানুষ জীবনে বেশী দেখিনি। চিরদিন শিশুর মতো একটি অনাবিল মন বজায় রাখার জাগতিক কষ্ট অনেক, সে বড় কঠিন সাধনা।

ছোট মামাও আজ নেই, তাই অনেক কথা মনে পড়ে। দাদুর ব্যবসা ছিলো বিহারের সাঁওতাল পরগণায়। অভ্র খনি ছিলো দাদুর। ছোটমামার প্রথম যৌবনে সেই অভ্রর খনির দেখাশোনার ভার পড়েছিল তাঁর উপর। অভ্রর ব্যবসা সম্বন্ধে ছোট মামা কতটুকু উৎসুক ছিলেন, অথবা কতটুকু জেনেছিলেন সে বিষয়ে আমার তখন এবং আজও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ব্যবসা, কোনো ব্যবসাই তাঁর ধমনীতে ছিলো না। তাঁর দুই কবি-চোখ মুগ্ধ হয়েছিল সাঁওতাল পরগণার বনপাহাড়ের অপূর্ব সৌন্দর্যে। পরম অসুবিধার মধ্যে থেকেও, এই ডিজেলের ধোঁয়া-ভরা আবর্জনাময় শহরে বাস করেও তিনি চিরদিন তাঁর শালবন, খাণ্ডুলী পাহাড় ও উশ্রী নদীর কল্পজগতে বাস করে গেছেন।

কোনো গরমের সন্ধ্যাবেলায় ছোটমামা আমাদের বাড়িতে আসতেন। বসবার ঘরে আলো নিভিয়ে তিনি গল্প বলতেন। তখনকার দিনে সন্ধ্যের পর কলকাতায় এমন এক দখিনা হাওয়া ছাড়তো যে, সেই হাওয়া

আজকাল এই মাল্‌টিস্টোরিড শহরে আর বয় না। সারাদিনের আর্দ্রতা-ভরা গরম যে ক্লান্তি পুঞ্জীভূত করে তুলতো, সেই সমস্ত ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে যেতো মুহূর্তের মধ্যে সন্ধ্যের পরের সেই হুহু মিষ্টি বাতাসে।

পথ দিয়ে কুল্‌ফী মালাইঅলা, চাই কুল্‌ফী মালাই বলে হেঁকে যেতো। ফুলঅলা ফিরি করতো বেলফুলের মালা অথবা রজনীগন্ধা। চান-টান করে উঠে তুমি ধূপকাঠি জ্বালাতে, তারপর ছোটমামার জন্যে চা করে নিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে তুমি আমাদের সঙ্গে বসতে এসে।

ছোটমামা গল্প করতেন টিকায়েতের। ডাকাইত টিকায়েত্‌, অত্যাচারী টিকায়েতের। যে কুলীদের সুদের লোভে সর্বস্বান্ত করতো, তাদের মেরে খাদে ফেলে দিতো। সেইসব গল্প শুনতে শুনতে দেঁহাতী সরল মানুষদের কষ্টে তখন আমার চোখে জল এসে যেতো।

ছোটমামার এক বন্ধু ছিলেন। মনুমামা। তাঁকে আমার একবারই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো গিরিডিতে। এখনও তাঁর চেহারাটা মনে আছে। ছ'ফিট লম্বা ধবধবে ফর্সা, একটা বুক-খোলা নীল রঙের টুইলের শার্ট, ধুতির ওপরে পরা। শার্টের হাতা গোটানো। এমন চমৎকার সুগঠিত, সুপুরুষ বাঙালী চেহারা আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। সেই মনুমামা টগ্‌বগ্‌ করে ঘোড়া ছুটিয়ে খাদে খাদে ঘুরে বেড়াতেন। দুর্ধর্ষ টিকায়েত্‌রাও তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকতো। মনুমামার পিঠে বাঁধা থাকতো চামড়ার বেল্টে লাগানো দোনলা বন্দুক। চাঁদনী রাতে আলোছায়ার বুটি-কাটা গালচের রাস্তা বেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে পাড়ি দিতেন মনুমামা।

একবার ছোটমামা আর মনুমামা অভ্র খনিতে যাওয়ার পথে এক গ্রামে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছেন। যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই ঘরেই সকালবেলা জঙ্গল থেকে ধরে আনা একটি ভাল্লুকের বাচ্চা এনে রেখেছিলো গ্রামের লোকেরা। চাঁদনী রাত। বসন্তের দিন। সন্ধ্যার পর বেশ হিম হিম ভাব থাকে তখন পাহাড়ে জঙ্গলে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। মহুয়া আর করৌন্‌জের গন্ধ ভাসছে

হাওয়ায়। পাহাড়ী কোকিল ডাকছে পাগলের মতো! পাশের বস্তীতে ঝুমুরের গান হচ্ছে মাদলের সঙ্গে। দ্রিম্ দ্রিম্, দ্রিমি দ্রিম্ করে মাদল বাজছে আর তার সঙ্গে দেঁহাতী সুরের ঘুম পাড়ানিয়া গান।

মাটির ঘরের মধ্যে চৌপাই পেতে দুই বন্ধুতে রাতে খিচুড়ি খেয়ে শুয়েছেন। সারাদিনের ক্লান্তি রাতে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখে ঘুম এনে দিয়েছে। উপরে খাপ্‌রার চাল, ঘুমোবার আগে আগে সেই খাপ্‌রার চালের মধ্যে ছুঁচোর নাচানাচির নরম চিকন আওয়াজ তাঁদের কানে এসেছিলো। দুদিকে দুটি উঁচু জানালা, কাঠের শিক বসানো, তা খুলে দিয়ে তাঁরা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে কী একটা শব্দ শুনে ওঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। বাইরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। মনুমামা কোনোদিনই ভীরু ছিলেন না, কিন্তু ছোটমামা ভীরু ছিলেন। তাঁর সব রকম ভয় ছিলো। ভূতের ভয়, বাঘের ভয়,ভাল্লুকের ভয়, টিকায়েতের ভয়। তাই ছোট-মামা কথাবার্তা না বলে যে চাদরটা বুক অবধি ছিলো, সেই চাদরটা তাড়াতাড়ি মুখ অবধি টেনে মুখটাও ঢেকে নিয়ে নিঃসাড়ে শুয়ে রইলেন।

মনুমামা বললেন, কোন্ হ্যায় রে? বাহারমে কোন্ হ্যায়?

কিন্তু বাইরের আগন্তুক কোনো উত্তর দিলো না। দরজার মধ্যে খচ্ খচ্ খচর খচ্ করে কী একটা শব্দ হতে লাগলো। মনুমামা পা টিপে টিপে সেই মাটির ঘরের কাঠের গরাদ লাগানো জানালার কাছে উঠে গেলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেন, এক বিরাট ভাল্লুক পিছনের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পায়ের নখ দিয়ে দরজাটাকে আঁচড়াচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে মনুমামা তাড়াতাড়ি ছোটমামাকে ডাকলেন। বললেন, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ছোট্‌কা, কী অপূর্ব দৃশ্য! জীবনে এমনটি আর দেখতে পাবি না।

বলতে বলতে মনুমামা জানালাতে দাঁড়িয়ে ধারাবিবরণী দিতে লাগলেন: কী সুন্দর চাঁদের আলো, দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে ভাল্লুকটাকে।

বুকের মধ্যে একটা শাদা ভি চিহ্ন। কী বিরাট ভাল্লুকটা রে। আমার চেয়েও লম্বা। উঠে আয় ; উঠে আয়। দেখবি তো উঠে আয়। ছোট্‌কা।

ছোটমামা বললেন, না। আমি দেখবো না।

কিন্তু ভাল্লুকটা আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো। তার মাকে বাইরে দেখে ভিতরের ভাল্লুকের বাচ্চাও কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্ করে সমানে তার মার কাছে নালিশ জানিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন বাচ্চাকে তার মার কাছে দেওয়া যায় কী করে ? দরজা খুললেই তো বিপত্তি! আর ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলের মানুষ যে-জানোয়ারকে বাঘের চেয়েও বেশী ভয় পায় তা হচ্ছে এই ভাল্লুক।

মনুমামার গাঁয়ের লোকদের উপরে ভীষণ রাগ হলো।

ভাবলেন, পরদিন ওদের ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে। প্রথমতঃ এরকম বিপত্তি ঘটবার জন্যে এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের ঘুমের দফারফা করার জন্যে। কিন্তু সে তো সকাল হলে! এখন রাত কী করে কাটে!

অনেক করে মনুমামা ভাবতে ভাবতে শেষে একটা বুদ্ধি বের করলেন। দেখলেন, ঘরের কোণে দুটি চক্‌চকে টাঙি দাঁড় করানো আছে।

মনুমামা সেই টাঙি তুলে নিয়ে মাটির ঘরের জানালার কাঠের গরাদগুলো ঝপাঝপ্ কোপ মেরে কেটে ফেললেন। সেই কালো-কোলো, গুবলু-গাবলু ভাল্লুকের বাচ্চাটাকে দু'হাতে তুলে ধরে সেই জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরে গলিয়ে দেবার মতলব করলেন। মা ভালুককে প্রাণে মারার কোনো ইচ্ছা ছিলো না তাঁর।

কিন্তু গলিয়ে দিতে চাইলেই কি গলে ? বাচ্চাটা বেশ নাদুস-নুদুস ছিলো, কিন্তু জানালার যা ফুটো তা দিয়ে বাচ্চাটাকে গলিয়ে ফেলা মুশকিল। অথচ বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়ে ভাল্লুক মা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছিলো এবং সে তখন দু'হাতের নখ দিয়ে মাটির ঘরের দেওয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাঙতে আরম্ভ করলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে মনুমামা জানালার গরাদের উপর এবং নীচের

দিকের কিছুটা মাটি ঐ টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলে ভাল্লুকের বাচ্চার গলে যাবার মতো জায়গা হতেই তাকে সেই ফুটোতে বসিয়ে দু'হাতের মুঠো জড়ো করে, যেমনি করে লোকে ভলিবল খেলে, তেমনি করে জোরসে এক ধাক্কা মারলেন! ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন বাইরে তার থপ্ করে পপাতধরণীতলের আওয়াজ।

বাচ্চাটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী দৃশ্য তা ভোলবার নয়।

দৃশ্য অবশ্য ছোটমামা দেখেননি, তিনি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মনুমামার ধারাবিবরণী থেকে যেটুকু শুনেছিলেন, সেটুকুই আমাদের অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে এবং এক অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলতেন।

বাচ্চাটি নীচে পড়তেই ভাল্লুক-মা দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিলো। এক লাফে চার পায়ে সেই চন্দ্রালোকিত, ধূলি-ধূসরিত আলো-ছায়ার ডোরাকাটা পাহাড়ী গাঁয়ের পথে, বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যেতে লাগলো কুঁক্ কুঁক্ আওয়াজ করতে করতে। আর তার পাশে পাশে বন্দীদশা থেকে সদ্যমুক্ত বাচ্চাটি মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজী খেতে খেতে চলতে লাগলো।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তারা কিছুদূর পথ বেয়ে হেঁটে গিয়ে, পথ ছেড়ে বাঁদিকে ঢুকে জানোয়ার-চলা সরু পথ দিয়ে চলে গেলো কোথায় না কোথায় আলো আঁধারের গা ছমছম্ বনে।

॥ ৬ ॥

তুমিও সবসময় গল্প করতে গিরিডির কথা। মামারা কেউ এলে ত কথাই নেই। শালবন, উশ্রী নদী, খাণ্ডুলী পাহাড়। উশ্রী নদীর তট, নদীতে পিকনিক, চাঁদনী রাতে। বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রে বসন্তোৎসব তোমাদের স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই হিমাংশুবাবুর কথা, বড়মামার কথা, গল্প করতে।

তোমার ছেলেবেলায় বড়মামার তখনও কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু তখনই তাঁর কবি-প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিলো। তোমার পুরনো দাইয়ের কথা, তোমার যে একটা ছোট্ট শাদা পোষা-ভেড়া ছিলো, সেই ভেড়াটার কথা। দাদুর কথা, দিদিমার কথা. সাঁওতালী গ্রামের শীতের রাতের মাদলের আওয়াজের কথা, তোমার কাছে সেইসব গল্প শুনতে শুনতে ছোটবেলা থেকে কল্পনার জগতের যে চিত্রকল্প আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিলো, সেইসব ছবি আমৃত্যু বয়ে বেড়াতে হবে আমাদের।

বাবার স্বাধীন পেশা শুরু করার বছর তিন-চার পর একবার কোডারমা গেলাম আমরা সকলে মিলে। ক্রীশ্চান মাইকা কোম্পানীর একটা অতিথিশালা ছিলো শিবসাগরে। কোডারমা স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা গাড়িতে গিয়ে তবে মাইকা কোম্পানীর চত্বরে পৌঁছোনো যেতো। ভারতীয় মালিক সবে ইংরেজ মালিকদের কাছ থেকে সেই কোম্পানী কিনেছেন। পেশার সূত্রে সেই মালিকদের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ ছিলো। সেই অতিথিশালা, পাঁচ-নম্বর বাংলোটি কী যে চমৎকার ছিলো!

একতলা মার্বেল মোজাইকের বাংলো, প্রায় দুশো বিঘে মতন নিয়ে তার হাতা, পিছনে শালবন, সামনে নুড়ি ঢালা রাস্তা, কেয়ারী-করা ফুলের বাগান। বিকেলবেলা সহিস ঘোড়া সাজিয়ে আনতো আমাদের

ঘোড়া চড়াবার জন্যে। শিকার যাত্রার জন্য একটা জীপ এবং একটা ওয়েপন ক্যারিয়ার সবসময় তৈরী হয়ে থাকতো, আর থাকতো দুটি প্রাইভেট গাড়ি।

বাবুর্চিখানার দেখাশোনার জন্যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, স্টুয়ার্ডের কাজ করতেন তিনি। লম্বা দাড়িওয়ালা মুসলমান বাবুর্চি। কী ভালোই যে রান্না করতো তারা।

বিকেলে চায়ের সঙ্গে হান্টি পামার বিস্কিট্ দিতো। সে বিস্কিট্ তখন আসতো বিলেত থেকে! কতরকম স্বাদ ও চেহারার যে হতো হান্টি পামার বিস্কিট্ তা যারা না খেয়েছেন তারা জানেন না।

তুমি বারান্দার ইজীচেয়ারে বসে সারাদিন আনন্দে শালবনের দিকে তাকিয়ে থাকতে আর আমাকে বলতে, জানিস খোকন আমাদের গিরিডির বাড়ির পিছনে যে শালবনটা ছিলো ঠিক এইরকম দেখতে। সবুজ শালবন, কালো পাথর, টিয়ার ডাক, নীলকণ্ঠ পাখির নীল আকাশের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে উড়ে যাওয়া সব একরকম।

বড় ভালো লেগেছিলো তোমার কোডারমায় গিয়ে।

একদিন বিকেলে, মনে আছে; মেঘ করে এলো। এপ্রিল মাস। পয়লা বৈশাখের কাছাকাছি, আগে কি পরে মনে নেই। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেলো, তারপর ঝড় উঠলো, শুকনো পাতা উড়িয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে। ঝড়ের পরেই নামলো বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা, তারপর না-বৃষ্টি, না-রোদ, না-মেঘ, না-আলো সব মিলেমিশে কী এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নৈসর্গিক দৃশ্য হলো। সেকথা মনে পড়লে আজও আমার গায়ে আনন্দের কাঁটা দেয়! আমি আর তুমি পাশাপাশি বসে সেই আশ্চর্য অদৃষ্টপূর্ব দুর্লভ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তুমি নিঃশ্বাস ফেলে বলতে, আহা! ভগবানের কী লীলা!

তুমি প্রায়ই বাবাকে বলতে তারপরে, অনেক তো তুমি বড়লোক হলে, বাড়ি করলে, গাড়ি করলে, এতো কিছু করলে, এবার আমাকে বিহারের সাঁওতাল পরগণায় লালমাটি আর শালবনের মধ্যে একটা

ছোট্ট বাংলো করে দাও। শেষ জীবন আমি সেখানেই কাটাবো।

বাবা বলতেন, এসব কবি-কবি ভাব রাখো তো। বাইরে বাড়ি মানেই খরচ। প্রত্যেক মাসে মাসে মালীর মাইনে মানি-অর্ডার করে পাঠানো। বাঙালী বোকারাই খালি বাইরে বাড়ি বানায়।

তুমি শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে, দাওনা বাবা, আমার জন্যে না-হয় একটু খরচ করলেই।

বাবা বলতেন, ছেলেমানুষী কোরো না।

বাবা যা বলতেন, ঠিকই বলতেন, সে বিষয়ে কোনো ভুল ছিলো না। তবে তুমি যা বলতে তাও আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতে।

অন্য দশজন মেয়ের মতো তুমিও জাগতিক ব্যাপারে অবুঝ ছিলে, বাবার মতো প্র্যাকটিক্যাল লোকের পক্ষে তোমার এই ইম্‌প্র্যাকটিক্যাল শখ পূরণ করা সম্ভব ছিলো না।

এ-কথাটা আমার মনে ছিলো।

বড় হবার পর আমি যখন নিজে রোজগার করতে আরম্ভ করি, ঘটনাচক্রে বিহারেরই শালবন, লালমাটি, কালো পাথরে-ভরা একটি স্বল্পখ্যাত জায়গায় একটি ছোট্ট বাংলোর খোঁজ পাই। সে বাংলোটি ছিলো এক স্কচ্ সাহেবের। তিনি সেটি বিক্রী করে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানেই বসবাস করার ইচ্ছায়।

ছোটবেলা থেকেই তোমার মুখে তোমার কল্পনার বাড়ির যে বর্ণনা শুনেছিলাম, পরিবেশের যে বর্ণনা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে সেই জঙ্গল-পাহাড়বেষ্টিত ছোট্ট জায়গাটির বড় মিল ছিলো।

কিন্তু আমি তোমাকে আগে না দেখিয়ে সেই বাংলো কিনতে চাই নি।

একদিন যখন তোমাকে আর ছোটমাসীকে নিয়ে রাঁচী এক্সপ্রেসে ভোরবেলায় শীতের সকালে রাঁচীতে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে সে জায়গাটার দিকে রওয়ানা হলাম, তখন থেকে তোমার আনন্দ আর কে দেখে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা রাঁচী শহর ছেড়ে লোহার ডাগার

রাস্তায় পড়লাম। পথের পাশে কড়াইশুঁটির ক্ষেত, শর্ষে লেগেছে একদিকে, হলুদে হলুদ হয়ে গেছে মাঠ, কোথাও বা সরগুজা। দূরে কিতারীর ফিকে হলুদ-সবুজ ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। সকালের প্রথম রোদে রোদ পোয়াচ্ছে গাঁয়ের লোকেরা। লাটাখাম্বায় ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ করে জল তুলছে কুঁয়ো থেকে লাল শাড়ী পরা দেহাতী মেয়ে।

তুমি বললে, আহা রে! যেন মনে হলো গিরিডিতে এসেছি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়িতে যাওয়ার পর যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লাল ধুলো মেখে সেই বাংলোর সামনে দাঁড়ালো, আমি বললাম, মা চলো, বলে, ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে সেই বাংলোটার মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেলাম।

বললাম, দেখো মা, তোমার যদি পছন্দ হয়, তাহলেই কিনবো, নইলে কিনবো না।

তুমি দেখে বললে, আহা। কী ভালোরে খোকন! কিনে ফেল, কিনে ফেল। বড় ভালো লাগবে আমার।

সে বাংলোর দরদাম নিয়ে আরও একটু বিতর্ক করা যেতো। তুমি বললে, আহা, সে বেচারীরা বিপদে পড়ে শস্তায় বিক্রী করে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, এইসময় দর করিস না, এতে ভগবান পাপ দেবেন। ওরা বেশী তো চায় নি। ওরা যা চায়, তাই দিয়ে দে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তোমার কথাই রাখবো।

সে বাংলো কেনা হলো। বাবা নিজে গিয়ে থেকে দু মাস বাংলো সারিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে দিলেন।

তুমি যখন সেখানে গিয়ে ছিলে, তখন বড় কষ্ট করেই ছিলে। তখন কোনো আসবাব কেনা হয় নি। খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা ছিলো। অসুবিধা ছিলো অনেক কিছুর। তখন একটা ন্যাড়াবাড়িতে যতরকম অসুবিধা থাকা সম্ভব। সবরকম অসুবিধা তুমি সহ্য করেছিলে। পরে সেই বাংলোতে যতটুকু আসবাব পত্র না-নইলে নয় মোটামুটি, জঙ্গলের মধ্যে তাই দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলাম। রান্নার লোকের

বন্দোবস্ত ছিলো। মালী ছিলো। সবরকম মাঝামাঝি আরামের বন্দোবস্ত ছিলো। অথচ তখন তুমি এতোই অসুস্থ হয়ে পড়লে, যে সাজানো-গোছানোর পর একদিনও তুমি সেখানে গেলে না।

তোমার মতো মায়েদের পক্ষে কোনোদিনও স্বার্থপর হওয়া তো সম্ভব হতো না। যখনই তোমাকে জোর করেছি, এবার যেতেই হবে, আমার সঙ্গে চলো, আমি যাচ্ছি। তখনই তোমার হাজার রকম অসুবিধা। কখনও বাবার শরীর খারাপ, কখনও ভাইদের শরীর খারাপ, কখনও কোনো বধূমাতা আসন্ন-প্রসবা, কখনও তোমার নাতি-নাতনির অসুবিধা হবে তুমি চলে গেলে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তোমার অসুবিধার শেষ ছিলো না, তুমি সংসারের মধ্যে শেষ জীবনে এমনভাবে মমতার শিকড় ও সে শিকড়ের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছিলে, হয়তো নিজের অজানিতেই যে, তোমাকে সেই শিকড় এবং শিকল ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাওয়াই এক সমস্যা ছিলো।

অথচ তুমি সবসময়েই শেষের দিকে বলতে, আমার বড় কষ্ট হয় রে. ঘর সংসার করতে ভালো লাগে না।

অথচ তোমার চরিত্রে এমন কিছু ছিলো না, যে তুমি সংসার ছেড়ে দাও, তোমার ছেলে-মেয়েরা ভালোভাবে খেতে পেলো কি পেলো না, এ নিয়েও তোমার চিন্তার অন্ত ছিলো না। তারা কী খেলো এবং আদৌ খেলো কি না এসব ছিলো তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্বর ব্যাপার। বাড়িতে দাসদাসী যতই থাকুক না কেন। যদিও ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই অনেক বড় হয়ে গেছিলো সকলেই, প্রত্যেকেই বিবাহিত, প্রত্যেককেই দেখার লোকজন ছিলো তবুও।

যদিও তুমি পাঁচ-সাত-দশ দিন না থাকলে বাবার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা ছিলো না, কারুরই তেমন কিছু অসুবিধা ছিলো না তুমি না থাকলে; কিন্তু তুমি না থাকলে কারুর যদি কিছু অসুবিধা হয়, এই ভেবে ভেবে তুমি নিজের জীবনে সুখ কখনও ছিনিয়ে নিতে পারলে না।

তুমিও চলে গেলে, আমার কাছে সেই বাংলোর আকর্ষণও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেলো।

আমার ঘনিষ্ঠ অন্য কেউই জানে না সেই জঙ্গলের পর্ণকুটির কেনার ইতিহাস। কার ভালো লাগবে, কে গিয়ে থাকবে বলে তা কিনেছিলাম।

যখন দেখলাম, ঐ জঙ্গলে না-ডাক্তার, না-হাসপাতাল, না-তোমার শারীরিক অবস্থা এমন, যে তুমি সেখানে গিয়ে বেশীদিন থাকতে পারো, তখন থেকেই ভাবছিলাম যে, এই বাংলো রেখে লাভ কি?

তারপর তো তুমি হঠাৎ চলেই গেলে। মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে। তোমার চলে যাবার পর সে বাংলোর আর কোনো প্রয়োজন আমার কাছে ছিলো না। তাই তা হস্তান্তর করে ফেললাম। হস্তান্তরের কারণও গোপনই রইল।

যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতো বাংলোটিকে, সেই বাংলোর পরিবেশকে, ঝুমকো জবার গাছটিকে – যে গাছে হাজার হাজার জবা ফুটতো, সেই তুমিই যখন নেই, তখন ঐ বাংলোর কোনো দামই ছিলো না আর আমার কাছে।

॥ ৭ ॥

ছোটবেলায় যখন আশেপাশের বাড়ির মাসীমারা তোমাব সঙ্গে গল্প করতে আসতেন অথবা আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং তোমার সঙ্গে গল্প করতেন, তখন আমরা ছোটরা কাছে থাকি, তুমি তা একেবারেই পছন্দ করতে না।

অথচ এও মনে পড়ে না যে, তুমি কখনও বাইরের লোকের সামনে আমাদের বকেছো। চোখ তুলে আমার দিকে তাকালে তোমার চোখে কী লেখা আছে তা বুঝতে পেতাম এবং নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতাম অন্য ঘরে। আমার মনে পড়ে না তুমি কখনো আমাকে মেরেছিলে। তোমার কাছে বকুনীও খুব বেশী খাই নি। না বকে, না মেরে, কি করে শাসন করতে হয় তুমি তা ভালোভাবেই জানতে।

আমাদের বাড়িতে তখন রেডিও ছিলো না, তখনকার দিনে রীতি-মতো অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেই রেডিও থাকতো। আজকালকার মতো রেডিও, ট্রানজিস্টার, টি-ভি'র বহুল প্রচার হয়নি। হয়তো এতো সস্তাও ছিলো না। টাকার অঙ্কে হয়তো আজকের মতো দাম ছিলো না। কিন্তু তখনকার দিনে সেই টাকার অঙ্কের মূল্য ছিলো বহু বহুগুণ বেশী।

দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ির সেই পিছনের মাঠে যখন মুসলমান ধুনুরী তার সবুজ চেক-চেক লুঙ্গি পরে হাঁটু গেড়ে বসে তুলো ধুনতো প্রিং-প্রিং করে শব্দ করে, আর তুলোর নরম হালকা আঁশ উড়তো হাওয়ায় হাওয়ায়, তখন মাঠের ঐ পাশের বাড়ি থেকে রেডিওতে কানন দেবীর গান ভেসে আসতো, 'হারা মরু নদী, ক্লান্ত দিনের পাখি।'

দুপুরবেলায় অনুরোধের আসর শুনতাম আমি, আমাদের পুবের জানালার তাকে বসে। এতো আওয়াজ ছিলো না তখন কোলকাতায়। এতো লোক ছিলো না। এতো ট্রাম, এতো বাস, এতো গাড়ি, এতো ফিরিওয়ালা কিছুই ছিলো না। তখন অনেক দূরের কোনো বাড়িতে রেডিও

বাজলেই সে আওয়াজ অতি সহজেই অন্য বাড়ি থেকে শোনা যেতো।

মহালয়ার ভোরে পাড়াতে অল্পসংখ্যক রেডিও থাকা সত্ত্বেও শুধু আমাদের পাড়াই নয়, সমস্ত কোলকাতা শহরই গম্‌গম্‌ করে উঠতো শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনায়।

একবার পুজোর আগে আগে, বোধহয় মহালয়ারও দিন সাতেক আগে দীপালির ভাই দিলীপ হঠাৎ বলল যে, ওর বাবা একটা রেডিও কিনছেন।

কি কারণে মনে নেই আজ; ওর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হওয়াতে, ও আমাকে বলল, ঠিক আছে আমার সঙ্গে তুই ঝগড়া করলি? আমাদের বাড়িতে রেডিও আসুক, তোকে আমি শুনতে দেবো না।

সে কথা তোমাকে বলাতে তুমি বললে, তুমি ওদের বাড়ির রেডিও শুনতে চেয়েছো কেন? আর তুমি তো বোকা। যদি দোতলায় রেডিও বাজে, তুমি তো এমনিতেই একতলা থেকে শুনতে পাবে। এ নিয়ে অশান্তির কী আছে?

দিলীপের বাবা যদি রেডিও কেনেন, তবে আমার বাবা কেন রেডিও কিনতে পারেন না এই প্রশ্ন করেছিলাম তোমাকে।

তুমি প্রথমে এর কি উত্তর দেবে ভেবে পাওনি। তারপর বলেছিলে, সবাই কি সব কিনতে পারে? না সকলের সব থাকে? তোমরা তো কত ভালো আছো খোকন। তোমাদের কত আত্মীয়-স্বজন, এই পাড়াতেই তোমার কত বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা তোমার চেয়েও অনেক অসুবিধায় থাকেন।

তুমি বলতে, সবসময় নীচের দিকে তাকিও। উপরের দিকে তাকাবার কোনো শেষ নেই।

সেদিন কথাটা সামান্য শুনিয়েছিলো কিন্তু আজ বুঝি যে, কথাটা আদৌ সামান্য ছিলো না।

তুমি আরও বলতে, যাদের সবই আছে, যাদের বাবা মায়েরা যাদের সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন, তাদের নিজেদের তো করে নেবার মতো কিছু

বাকি থাকে না। বেশ তো, তোমাদের অনেক কিছু নেই, অন্যদের আছে। তুমি বড় হও, ভালো করে লেখাপড়া শেখো, তারপরে তুমি সবকিছু নিজে করে নেবে। নিজের জিনিস নিজে করবে, সেটা কত বড় আনন্দের কথা। বাবা এনে দিলে তো বাবাই দিলেন। তুমি নিজে করার আনন্দ কি বাবা কিনে দেওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বড় নয় ?

অনুপাতে বয়সের সকলেরই আত্মসম্মান জ্ঞানটা বাড়ে না। তখন ঐ বয়সে অত কিছু বোঝার মতো ধৈর্য আমার ছিলো না। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, আজকে বুঝি যে, সেই সাধারণভাবে খেলার ছলে বলা কথাগুলি কত গভীর !

আমি আর আমার ক্লাস-থ্রীর বন্ধু শিবু, দুজনে যখন স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম জলযোগের সামনে দিয়ে, তখন প্রায়ই আমাদের একই আলোচনা হতো।

জলযোগের দোকানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রকাণ্ড ছবি ছিলো। হাতে-আঁকা পাশে লেখা ছিলো যে, তিনি পয়োধি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছেন।

শিবু বলতো. এর চেয়ে বাজে কথা হতেই পারে না।

আমি বলতাম, কেন ?

শিবু বলতো, অত বড় দাড়ি গোঁফ নিয়ে কেউ কখনও দই খেতে পারে ? সমস্ত দই তো গোঁফে দাঁড়িতেই লেগে যাবে।

আমি ওর কথায় ভীষণ চিন্তায় পড়ে যেতাম।

এছাড়াও আমরা আর যে-বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতাম, তা হলো হঠাৎ যদি আমাদের কেউ অনেক টাকা দিয়ে দেয় অথবা লটারীতে টাকা পাই, তাহলে জলযোগে ঢুকে আমরা কোন্ কোন্ মিষ্টি খাবো। আমার সঙ্গে শিবুর রসগোল্লা সম্বন্ধে মত মিলতো, আর কোনো ব্যাপারেই মিলতো না।

শিবু বলতো, মিছিমিছি আলোচনা করে কী লাভ বল্ ? টাকা পেলে তবে তো খাবো ? যতদিন না পাচ্ছি, ততদিন আর এমনি

এমনি আলোচনা করে লাভ নেই। কাল থেকে, বুঝলি, আর আমরা ডানদিকের দোকানে তাকাবোই না। কিন্তু আবার পরদিন সেই একই আলোচনা আমাদের করতে দেখা যেতো।

আমার বড় পিসেমশাই যখন আসাম থেকে আসতেন কোলকাতায় এবং আমাদের বাড়িতে উঠতেন, তখন আমাদের খুব আনন্দ হতো।

বড় পিসেমশাইয়ের অবস্থা খুব ভালো ছিলো। কিন্তু অবস্থা ভালো থাকলেই মানুষের মন বড় হয় না। কিন্তু পিসেমশাই ব্যতিক্রম ছিলেন। এমন আমুদে, হাসিখুশী, এমন দরদী ছিলেন যে, তাঁকে ভালোবাসতো না এমন কেউই বোধহয় ছিলো না।

আমার ছোট পিসেমশাইও কোলকাতায় থাকতেন, এবং যখনই তাঁর তখনকার বেহালার বাড়িতে যেতাম, আমাদের বড়ই আদর যত্ন করতেন। নিজে বাজারে যেতেন আমাদের জন্যে। ছোট পিসীমার অনুপাতের জ্ঞানটা কম ছিলো। একসঙ্গে আটটা দশটা ডিম দিয়ে ওমলেট বানিয়ে বলতেন, ছেলেমানুষ! খেয়ে ফ্যাল। এই অনুপাত জ্ঞানের অভাবেই একবার ছোট পিসীমার প্রাণ সংশয় হয়েছিল। ভাল ফল হওয়ার জন্যে একসঙ্গে দশটি জোলাপের বড়ি খেয়ে ফেলে তাবৎ আত্মীয়-স্বজন মহলে খবরের সৃষ্টি করেছিলেন একবার।

বড় পিসেমশাই যেহেতু এখানে থাকতেন না, উনি এলে যেন বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো।

তুমি কোন্ সিনেমা দেখতে যাবে, বাবা চিতলমাছের পেটি ভালোবাসেন না কই মাছ? আমরা কে কী খেতে ভালোবাসি, এইসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বড় পিসেমশাই আমাদের কোলকাতার নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরাট বিরাট ঢেউ তুলতেন।

যেবার প্রথম আমরা বড় পিসীমার বাড়িতে যাই আসামে, সেকথাও পরিষ্কার মনে আছে। তার পরেও বহু বহুবার গেছি সেখানে, কিন্তু সেই প্রথমবারের যাওয়ার কথা বোধহয় কোনোদিনই ভুলবো না। বাবা কাজের জন্য যেতে পারেন নি। আমরা একাই গেছিলাম।

পার্বতীপুর জংশন বিরাট বড় জংশন। সে স্টেশনে গাড়ি বদল করে, উত্তরবঙ্গ পেরিয়ে আসামের পরে কোক্‌রাঝাড় বলে একটা ছোট্ট ঘুমন্ত স্টেশনে আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। সিমেণ্ট বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম নয়, খোয়ার প্ল্যাটফর্ম। এক শীতের শেষ বিকেলে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত ছোট্ট স্টেশনে লাল পাড়ের কালো শাল গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অল্প-ঘোমটা টানা তোমার সুন্দর মুখের ভাবটি আজও আমার মনে আঁকা আছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে স্টেশন, স্টেশন মাষ্টারের ছোট্ট ঘর, তাতে টিম্‌টিম্‌ করে লণ্ঠন জ্বলছে। স্টেশনের পাশেই ছোট্ট লেভেল-ক্রশিং। ধূলি-ধূসরিত কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে। বিরাট বিরাট শাল আর সেগুনের গাছ, আরও কত নাম-না-জানা গাছ, জার্মান জঙ্গলের গায়ের কটু ও উগ্র গন্ধ শীত-সন্ধ্যার সেগুন গাছের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে ছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল মোষের গাড়ির মোষের গায়ের গন্ধ।

আমরা যেতেই পিসেমশাই যে মোষের গাড়ির সঙ্গে গাড়োয়ান এবং অন্য একজন লোককে আমাদের আনতে পাঠিয়েছিলেন, তারা হৈ হৈ করে এসে আমাদের মালপত্র সব তুলে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলল। মোষ জোড়া হলো গাড়িতে। ছইয়ের নীচে মোটা করে খড় পাতা, তার ওপরে বিছানা বিছানো। পায়ের উপর বিছিয়ে রাখার কম্বল। গাড়ির পেছন দিকে গাড়ির নীচে লণ্ঠন ঝুলছিল একটা, আর ছইয়ের উপর থেকে আরেকটা লণ্ঠন জ্বলছিল ভিতরে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। এক ডেক্‌চি ভর্তি ডিম সিদ্ধ, আর এক ঝুড়ি আসামী কমলালেবু—পথের খোরাকি হিসেবে সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন পিসেমশাই। আমরা নুন-গোলমরিচ দিয়ে ডিমসিদ্ধ আর কমলালেবু ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে খেতে অন্ধকার জঙ্গলের পথ দিয়ে চললাম তামাহাটের দিকে।

কাঁচা লালমাটির পথ দিয়ে ক্যাঁচোর কোঁচোর করে চলতে লাগল

মোষের গাড়ি। সে কী গভীর বন! দিনমানেই অন্ধকার থাকে।

যেতে যেতে পথে একটা সরু নদী পড়লো। জল থেকে ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো। জলজ গন্ধ, আর নদীর কুল্‌কুল্‌ আওয়াজ বনপথ ভরে রেখেছিলো। মোষের গাড়ি তার উপর দিয়েই পার হবে বলে নেমে পড়লো। নদীতে সবে গাড়িটা নেমেছে এমন সময় মোষ দুটো ভীষণ জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে শিং নাচিয়ে উঠলো।

গাড়োয়ান হঠাৎ বলে উঠল, বাঘ, বাঘ!

গাড়োয়ানের সাগরেদ যে ছোকরা তার পিছনেই বসেছিল সে বলল, মেলা বাঘ!

আমরা ছইয়েঁর মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখি, নদীর ডানদিকে যেখানে ছায়া আরও ঘন, সেখানে দুটি বিরাট বিরাট লাল লাল গোল গোল চোখ মোষ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

সঙ্গের সেই লোকটি ও গাড়োয়ান কী সব দুর্বোধ্য ভাষায় খুব জোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো।

আমাদের বলতে হলো না, আপনা থেকেই গলা দিয়ে যেন নানারকম কম্পমান স্বর বেরিয়ে আসতে লাগলো বিভিন্ন গ্রামে।

মোষ দুটো নাকে ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ করে আওয়াজ করতে লাগলো আর তাদের বিরাট বিরাট শিং দুটো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মাথা এদিক ওদিক করতে লাগলো। গাড়ি থেকে মোষজোড়া ছুটে যায় আর কী!

কিন্তু সেই লাল চোখ দুটো একটুও নড়ল না। যেখানে ছিলো, সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ পরে মনে নেই, আস্তে আস্তে সেই চোখ দুটো নদী ছেড়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

রাতের কোন্‌ প্রহরে যে গিয়ে পৌঁছলাম, সেকথা এখন আর মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় সন্ধ্যেরাতকেই গভীর রাত বলে মনে হয়। তবে একথা পরিষ্কার মনে পড়ে যে, পরদিন ভোরবেলা থেকে এক নতুন অনাবিল প্রাকৃতিক জগতে প্রবেশ করলাম।

॥ ৮ ॥

তুমি যেন সংসারের জোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে কেমন অন্যরকম হয়ে যেতে। তোমার চোখের ভাব স্নিগ্ধতর হয়ে উঠত, সব সময় তুমি হাসতে আর আমাদের বলতে, খোকন, তোমরা বেশী দুষ্টুমি কোরো না যেন।

পিসেমশাই ও পিসীমা আদর যত্নের কোনোই ত্রুটি রাখতেন না। সকালবেলায় আমাদের প্রাতঃরাশ হতো ক্ষেতের চালের সুগন্ধী ফেনা ভাত ডিমসিদ্ধ ও আলু দিয়ে। তারপর বেরিয়ে পড়তাম এদিকে ওদিকে। কোলকাতার শিশুর জন্যে আসামের সেই গোয়ালপাড়া জেলার ছোট্ট অখ্যাত গ্রামটিতে যে কত-না-কত আশ্চর্য এবং ভরন্ত ভালোলাগা অপেক্ষমাণ থাকতো, সেকথা আজকে মনে করে অভিভূত বোধ করি।

সেই তামাহাট গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গাধর নদী, তিস্তার সঙ্গে যার যোগ ছিলো। নদীর পারের মাঠ, ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছালি, পাখির ডাক, রাখাল ছেলের বাঁশীর তান সব যেন স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে হলুদ ফিন্‌ফিনে প্রায় স্বচ্ছ ডানায় রোদ চমকানো ফড়িংদের ঝাঁক বেঁধে ওড়া, মনে পড়ে নদীর জল থেকে সাঁতরে উঠে উদবেড়ালদের অন্য পারের বালির উপর শরীরের জলের ছাপ রেখে গর্তের মধ্যে ভিজে শরীরে আস্তে আস্তে ঢুকে যাওয়া।

নদীর মধ্যে বিরাট বিরাট চর ছিলো। শীতকালে সেই চরে বেদেরা ঘর বেঁধে থাকতো। চিতাবাঘে এসে তাদের গোরু, ছাগল, বেতোঘোড়া কখনও সখনও নিয়ে যেতো। নরম শাদা ফুলঝুরির মতো কাশের বন, ধুধু-শাদা দুধলী ঘাস, নীল আকাশ, আর তার পটভূমিতে গাঢ় নীল হিল্লোলিত প্রবহমান জলরাশি—সব মনে পড়ে।

পিসীমার বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ছিলো বিরাট বাগান, চাপ চাপ ঘন-সন্নিবিষ্ট কচিকলাপাতা সবুজ ঘাসের মাঠ। রঙ্গন, কাঠ টগর, সজনে, হলুদ রাধাচুড়ো এবং ঝুমকো জবার ডালে বসে টুনটুনি, বুলবুলি, রং-বেরঙের মৌটুসী পাখিরা সকাল থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কত কী বলতো।

খাটাশ এসে হানা দিতো মাঝে মাঝে, পাখির বাচ্চা ধরতো বাগানের গাছে উঠে, নয়তো মুরগীর খাঁচা থেকে মুরগী নিয়ে পালিয়ে যেতো।

সপ্তাহে একদিন করে হাট বসতো তামাহাটে। সপ্তাহের কোন্‌দিন, তা আজ মনে নেই। সেই হাটের কথা এ-জীবনে ভোলার নয়। সকাল থেকে গোরুর গাড়ির পর গোরুর গাড়ি এসে জমা হতো দূর দূর গ্রাম থেকে। গোরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে আসতো কমলালেবুর ঝুড়ি আর মহাশোল মাছ। সে মাছের যেমন চেহারা; তেমন স্বাদ। বড় বড় আঁশ, পাথালি করে রাখলে গোরুর গাড়ির এপাশ-ওপাশ ভরে যেতো এক একটা মাছে।

বেতো ঘোড়ায় চেপে আসতো দূরের বাগ্‌ডোগরা গ্রাম থেকে মুনসের মিঞা। গ্রামের মোড়ল। তার লাল-শাদা ঘোড়াটিকে সে পিসেমশাইয়ের গদী-ঘরের বারান্দার খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখতো। মুনসের মিঞার শাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি, পরনে কুর্তা আর লুঙ্গী।

সে এসে গদীঘরের দাওয়াতে বসে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতো আব আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সেসব গল্প শুনতাম। তার কথার মধ্যে দিয়ে এক সম্পূর্ণ অজানা অনামা জগতের ছবি আমার মগজে এসে বাসা বাঁধতো।

সারা দুপুর হাটের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। নরম খড়কুটো মেশা ধুলোর গন্ধ, চাষাদের গায়ের ঘামের গন্ধ, কেরোসিন তেলের গন্ধ, ঝোলা গুড়ের গন্ধ, মাছের গন্ধ, পাঁঠার গায়ের গন্ধ, গোরু মোষের গায়ের গন্ধ, ঝাল-বিস্কুটের গন্ধ, মুড়ির গন্ধ, চিঁড়ের গন্ধ, নতুন চালের গন্ধ, গন্ধে গন্ধে গন্ধময় হয়ে উঠতো সমস্ত দুপুর।

তারই মধ্যে আসতো একটি দুটি মোটর ভ্যান, বিড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন অথবা টর্চের ব্যাটারির বিজ্ঞাপন করতো তারা চোঙা-বসানো কলের গান নিয়ে। গান বাজতো উচ্চগ্রামে। সেকালের ফিল্মের গান। সেসব গান আজকাল সেই দুপুরবেলার হাটের মিশ্র গন্ধের মতোই তামাদি হয়ে গেছে। সে গান আর কেউই গায় না। সেসব গান আর কারো মনে নেই।

কোনো কোনো দিন পিসেমশাই তাঁর বন্দুক নিয়ে আমাদের সকলকে সঙ্গে করে গঙ্গাধর নদী বেয়ে নৌকোয় করে চলে যেতেন তিস্তার কাছে। সেখানে তিস্তাটা কী সুন্দর! শীতের তিস্তা। তার শাখা-প্রশাখা, কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল, তার নীচে নানা-রঙের নানা আকারের নুড়ি, আর সোনালী রঙের চরের পাশে বসে-থাকা লাল-মাথা, রেড-হেডেড পোচার্ড হাঁস। কোথাও বা চখাচখির ঘন সোনালী রঙে আকাশ সোনালী হয়ে যেতো। অন্যদিকে কালো-সাদা রাজহাঁসের দল তাদের হলুদ পা ও বিরাট বিরাট ডানায় রোদকে আড়াল করে কোঁয়াক্ কোঁয়াক্ কোঁয়াক্ আওয়াজ করে তাদের ধীর মন্থর শ্লথ উড়াল ঢঙে কোন অজানা দেশের পানে পাড়ি দিতো।

একবার মনে আছে আমরা গেছিলাম বৈশাখ মাসে। আলোকঝাড়ি পাহাড়ে সাত বোশেখীর মেলা বসে। তামাহাট থেকে অনেক দূরে সে মেলা। ভোরের বেলা গোরুর গাড়িতে চেপে গেলে মেলা দেখে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। আমরা সকলেই গেছিলাম। মনে আছে, তিনটি গোরুর গাড়ি বোঝাই করে। গোরুর গাড়ির উপরে খড় বিছানো, তার উপরে শতরঞ্জি পাতা. মাথার উপর ছই দেওয়া।

আস্তে আস্তে কুমারগঞ্জে পৌঁছে, কুমারগঞ্জকে ডানদিকে রেখে আমরা বাঁদিকে টুঙবাগান পেরিয়ে, রাঙামাটি হয়ে আলোকঝাড়ির পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

জঙ্গলের রূপ যে বিভিন্ন ঋতুতে কত বিভিন্ন তা সেই ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করে আসছি। বৈশাখ মাসে সব গাছের পাতা ঝরে

গেছে, সমস্ত জঙ্গল বাঘের গায়ের মতো লাল, পত্রহীন শাখা-প্রশাখার কালো কালো ডোরা কাটা। পোড়া পাতা, ঝরা পাতা, শুকনো পাতা পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। দুপুরের অলস মন্থর হাওয়া মচ্‌মচানি তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে সে পাতাদের একবার এপাশে একবার ওপাশে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘূর্নি হাওয়ায় সেই পাতারা কোন্ এক অদৃশ্য দেবতার প্রতি যেন তাদের আরতি জানাচ্ছে ঘূর্ণায়মান উৎসারিত শরীরে। আরতি শেষ করেই আবার নেমে আসছে ধরিত্রীর বুকে।

মেলার পথেই, মনে পড়ে, দেখেছিলাম, একটি সম্পূর্ণ পত্রশূন্য গাছে লাল মুরগীব ঝাঁক বসে আছে। যেন পলাশ ফুল ফুটে আছে কত!

হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, একটি লাল রঙের কোট্‌রা হরিণ পথের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে চলে গেলো দুটো গোরুর গাড়ির মাঝখান দিয়ে।

আমরা সব হৈ হৈ করে উঠলাম।

ভর দুপুরে যখন মেলায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন যে কী আনন্দ। যত দূর চোখ যায় হলুদ রঙের ছোপানো কাপড় পড়ে আদিবাসী মেয়ে-পুরুষরা এসেছে পুজো দিতে। পায়রা বলি দিচ্ছে, পাঁঠা বলি দিচ্ছে; লাল জঙ্গলের পটভূমিতে কালো পাথরের উপরে।

কুল্ কুল্ করে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণা, তাতে এখন জল কম, বালি বেশি। সেই ঝর্ণার পাশে পুজোর পর পুজো চড়ছে। সেই মেলাতে বিকিকিনিও হচ্ছে কম নয়। পাহাড়ী উপজাতি মাচরা তাদের বাদামী শরীরে, বাদামী চুলে কাঠের কাঁকই গুঁজে, তাদের হাতে বোনা তাঁতের রং-বেরঙের পোষাক পরে অনেক কিছুই নিয়ে এসেছে সেই মেলায়।

গারো পাহাড়ের পাহাড়তলীর কুমীর-ভরা জিঞ্জিরাম নদীর অববাহিকা থেকে এসেছে রাভা উপজাতিরা। তারা না জানি কোন্ না কোন্ পথ বেয়ে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছে তাদের যা কিছু কেনা-বেচার জন্যে। তীর-ধনুক হাতে আদিবাসী চিকন চেহারার চ্যাটালো বুকের ছেলেরা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পিছন পিছন

চলেছে তাদের বশংবদ লাল বা কালো রঙের ছুঁচলো-মুখ দিশী কুকুর।

জনসমাগমে গম্‌গম্‌ করে আওয়াজ উঠেছে। দূর থেকে মনে হয়, কোনো প্রচণ্ড জলপ্রপাত বুঝি। মেলায় যেখানে ভিড় খুব বেশী সেখান থেকে সরে এসে একটি দোলা মতো জায়গায়, যেখানে গ্রীষ্মের দাব-দাহতেও ছায়া ছিলো নরম নিভৃত, ঝর্ণা ছিলো এক ফালি, সেখানে বসে চড়ুই ভাতি করলাম আমরা। মা, পিসীমা, আরও কে কে যেন মিলেমিশে খিচুড়ি রান্না করলেন সঙ্গে বেগুনী ও কড়কড়ে আলু-ভাজা। আমরা ছেলেমেয়ের দল হৈ হৈ করে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ঘাস থেকে পাথর তুলে দেখি, তার নীচে শঙ্খচূড়ের বাচ্চা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারদিকে। অন্য পাথরের ফোঁকরে ছিলো মেঠো ইঁদুর। কী নরম পেলব শাদা তাদের চেহারা। নতুন চালের গন্ধ তাদের গায়ে। আদিবাসীরা দেখতে পেয়ে ফটাফট্‌ ধরে ধপাধপ্‌ পাথরে আছাড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে নিয়ে নুন দিয়ে খেয়ে ফেলল।

কত কী অ্যাডভেঞ্চার, কত কী খেলা চারদিকে ঘিরে ঘিরে।

মাঝে মাঝে তুমি ডাক দিতে। বলতে, সাবধান খোকন, গরমের দিন, সাপ আছে। এই ত কত বাচ্চা বেরুলো। পিসীমা বলতেন, বাঘের দেখা ; সাপের লেখা। সাপ থাকলেও কি কেউ দেখতে পায় ; সাপে কামড়ানো যদি কপালে থাকে তো কামড়াবেই।

তুমি বলতে, না বাবা, আমার ছেলেকে সাপে কামড়িয়ে দরকার নেই।

যখন ফিরে আসছিলাম আমরা, তখন পশ্চিমদিকে সূর্য ঢলে পড়েছে। টুঙ্‌ বাগানের মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা, বিরাট বিরাট টুঙ্‌ গাছ, জঙ্গলটা সবসময় স্যাঁতস্যাতে ছায়ানিবিড় হয়ে থাকে। নীচে নীচে ঢেঁকির শাকের মতো ঘন সবুজ ফার্ন, শ্যাওলা, গোপন ঝরণার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ, কট্‌কটি ব্যাঙের অস্ফুট কট্‌কট্‌ আওয়াজ, ভয় ভয়, শীত শীত সমস্ত পরিবেশটা।

সন্ধ্যের ঠিক মুখোমুখি একটা চিতাবাঘ পড়লো আমাদের সামনে। গোরুর গাড়ির গোরুরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, গাড়োয়ানরা তাদের বিচিত্র সব দেশজ আওয়াজ করে গোরুর ল্যাজ ধরে টানাটানি করে, ফটাফট্ পাচন-বারি পিঠে মেরে সাঙ্কেতিক ভাষায় গোরুদের বুঝিয়ে দিলে যে, ভয় নেই ; সোজা চলো।

অতএব তারা সোজাই চললো।

তামাহাটে ফিরে আসতে আসতে রাত্তির। সবে আমরা গদীঘর দিয়ে ভিতরে ঢুকছি, এমন সময় গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম।

পিসেমশাই চোখে কম দেখতেন। বাড়ির চাকর সন্ধ্যের আগে আগে মুরগীর খাঁচার দরজা বন্ধ করছিল। এমন সময় তার চোখে পড়ল বন-বেড়ালের মতো একটা কী যেন অন্ধকারে খাঁচার মধ্যে মুরগীদের সঙ্গে লাজুক বরের মতো বসে আছে। আর মুরগীগুলো প্রচণ্ড লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে। তাই না দেখে সে পিসেমশাইকে গিয়ে খবর দিলো। পিসেমশাই একে চোখে ভালো দেখতেন না, তার উপর অন্ধকার হয়ে গেছে। বন্দুকটা নিয়ে এসে উনি চাকরকে বললেন, তুই লণ্ঠনটা তুলে ধর্, আমি এক গুলি মেরে দিচ্ছি। কাল সকালে দেখা যাবে কত বড় বন-বেড়াল। গুলি মেরে দিচ্ছি বলেই পিসেমশাই গুলি করে দিলেন। সেই গুলির আওয়াজের শব্দই আমরা পেলাম ঢুকতে না ঢুকতেই। গুলি করার পর চাকর বাইরে থেকে খাঁচা বন্ধ করো দিলো।

সে রাত্তে উত্তেজনায় আমাদের কারোরই ঘুম হলো না। বন-বেড়াল, সে নাকি কি জিনিস ? তার কথা তো খালি বইয়েই পড়েছি, কখনও চোখে দেখিনি।

ভোরের প্রথম পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়লাম। তখন সবে দেওয়ালের টিনের ফুটোফাটা দিয়ে নরম আলো ঘরে এসে পড়েছে। দরজা খুলে হাত মুখ না-ধুয়েই দৌড়ে গেলাম পাট-বোঝাই গুদামঘরের পাশে সেই মুরগীর খাঁচায়। পাটের গন্ধটা ভারী মিষ্টি

লাগত নাকে। পরশও ভারী আরামের ছিলো, রেশমী নরম। গিয়ে দেখি, বন-বেড়াল কোথায়? বিরাট এক চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে খাঁচার মধ্যে। আর মুরগীগুলো বাঘটাকে এক ঘরে করে ভয়ে সিঁটিয়ে একটার ওপর আরেকটা হয়ে এক কোণায় জড়ো হয়ে আছে।

দৌড়ে গিয়ে আমি দরজা ধাক্কাধাক্কি করে সমস্ত ঘরের লোকদের তুললাম।

পিসেমশাই বেরিয়ে এসে বললেন. বলিস কী রে! চল্ তো দেখি। ততক্ষণে বাড়িশুদ্ধ সকলে এসে খাঁচাব সামনে জড়ো হয়েছেন, কেউ কেউ বললেন. খবরদার। খাঁচার দরজা খুলবি না। বাঘ কি অত সহজে মরে? কোথায় না কোথায় লেগেছে। ও মরার ভান করে আছে।

পিসেমশাই বললেন, ও মরে ভূত হয়ে গেছে। দেখছো না শরীরটা কিরকম শক্ত হয়ে গেছে।

পিসীমা বললেন শক্তই হোক আর নরমই হোক, তুমি মোটে ওর কাছে যাবে না, আর বাচ্চাদের এখান থেকে সরাও।

পিসীমার বকাবকিতে আমরা সবাই খাঁচার কাছ থেকে সরে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিসেমশাই বন্দুক নিয়ে এসে তাতে দুটো গুলি পুরে খাঁচার পাশে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর চাকর, তার নাম গেছি ভুলে; সে খাঁচার দরজা খুললো।

পিসেমশাই বললেন, ব্যাটাকে লেজ ধরে টান্। লেজ ধরে বের করে নিয়ে আয়।

সে বলল, বাবু লেজ ধরলে তো খাবে আমাকে। ওর মধ্যে আমি নেই। আমার গলায় চারটে ফোঁড়া হয়েছে। বড় ব্যথা। বাঘ গলা কামড়ে ধরলে যন্ত্রণাতে মরে যাব।

তখন পিসেমশাই বললেন, তুই কি বন্দুক ছুঁড়তে জানিস?

চাকর বলল, কোনোদিনও ছুঁড়িনি, গুল্‌তি ছুঁড়তে জানি, ইট ছুঁড়তেও।

তখন পিসেমশাই তাকে পাঠালেন বৈদ্যকাকুকে ডেকে আনতে।

হাটের অন্যদিকে বৈদ্যকাকুদের বাড়ি। তিনি এলেন। খালি গায়ে, ঘুম থেকে উঠে, চোখে কেতুর নিয়েই সোজা বিছানা ছেড়ে উঠে চলে এলেন বাঘ সন্দর্শনে। শাদা ধুতি পরে কালো সাঁওতালের মতো শ্যামলা চেহারার বৈদ্যকাকু। এবং এসেই সোজা পিসেমশাইয়ের জায়গায় বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালেন।

পিসেমশাই নিজেই চিতাবাঘের ল্যাজ ধরে টেনে খাঁচা থেকে বের করতে গেলেন। কিন্তু অত বড় ভারী চিতাবাঘ কি পিসেমশাই একা টেনে বের করতে পারেন? জোরে এক হ্যাঁচ্কা টান দিতেই পিসেমশাই নিজেই পড়ে গেলেন। তখন আমরা সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠলাম আর মা-পিসীমার বকাবকি অগ্রাহ্য করে আমরাও দৌড়ে গিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে চিতাবাঘের ল্যাজে হাত দিয়ে তাকে হেঁইও হেঁইও করে টেনে বের করলাম। আমাদের হাতে অনেকক্ষণ বাঘের গায়ের গন্ধ লেগে রইল।

॥ ৯ ॥

সেই যে বাগডোগরা গ্রামের মুনসের মিঞা, সে একদিন এসে খবর দিলো যে তাদের গ্রামে একটা চিতাবাঘ খুব দৌরাত্ম শুরু করেছে। আজকে গোরু নিচ্ছে, কাল ছাগল নিচ্ছে, এবার কোনদিন মানুষ নিয়ে টানাটানি করবে।

পিসেমশাইকে বললে যে, কত্তা আপনি চলেন।

পিসেমশাই বললেন, আমি চোখে দেখি না, রাতের বেলায় কি আমি সে বাঘ মারতে পারবো? তার চেয়ে মুনসের তুমি রতুদাদাকে নিয়ে যাও।

পিসেমশাইর পাশের বাড়িতে থাকতেন রতুজ্যেঠু। পিসেমশাইয়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাঁর একটা ছোটখাট কারখানা মতো ছিলো। তিনি জানতেন না এ হেন হাতের কাজ নেই। পেটা মজবুত চেহারা, ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরতেন। খালি গা, সবসময় কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

তাঁর বড় ছেলের নাম ছিলো এককড়ি! আর পিসেমশাইয়ের দাদার ছেলের নাম ছিলো তিনকড়ি। আমাদের কড়িদা।

কড়িদা আমার চেয়ে বয়সে সামান্যই বড় ছিলো। আমার বন্ধুর মতো। কড়িদার মতো অমন নরম, হাসিখুশী, পরোপকারী, ভাল মানুষ আমি আমার জীবনে দেখিনি। কী আশ্চর্য! পৃথিবী বোধহয় ভালো মানুষদের বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। নইলে তুমি চলে যাবার আগেই আমাদের সমবয়সী হয়েও কড়িদা কেন এতো বছর আগে হাসতে হাসতে হঠাৎ চলে গেল!

যারা সবচেয়ে ভালো, যারা থাকলে এই কুচক্রী কুটিল পৃথিবী

মানুষের বসবাসের পক্ষে অনেক সহনীয় হতো, তারাই কেন যে আগে চলে যায় তাড়াতাড়ি বুঝি না।

রতুজ্যেঠু বললেন, বাঘ মারবে? চলো।

পিসেমশাই, সেহেতু তাঁর বন্দুকটাও আমাদের দিলেন। তার আগে বন্দুক চালানো একটু আধটু শিখেছি। কিন্তু বাঘ? ওরে বাবা!

রতুজ্যেঠুর থারটি-এইট মডেলের একটা ভি-এইট হুড-খোলা ফোর্ড গাড়ি ছিলো। সেই গাড়িতে চড়ে আমি, রতুজ্যেঠু আর কড়িদা একদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর চললাম বাগডোগরা গ্রামের দিকে। মাঠ পেরিয়ে, হাট পেরিয়ে, চষা ক্ষেত পেরিয়ে, অনেক অনেক ধুলো উড়িয়ে বিকেল বিকেল আমরা এসে পৌঁছলাম বড় বড় গাছে ঘেরা ছোট্ট একটি গ্রামে। বাগডোগরা গ্রামে।

মুনসের সর্দার বড় খাতির করলো আমাদের। বড় বড় কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি পেতে দিলো বসতে। কী খেতে দেবে, কী করে আমাদের আদর করবে সে ভেবেই কূল পেলো না। বলল, একটা বড় শাদা পাঁঠা বেঁধে রেখেছে ঝাঁকড়া আমগাছের নীচে, বাঘের চলাচলের রাস্তায়। সন্ধ্যেবেলার আগে সেই আম গাছে বসলে বাঘের সঙ্গে মোলাকাৎ নিশ্চয়ই হবে।

রতুজ্যেঠু সঙ্গে তাঁর একনলা বন্দুক এনেছেন, তিনি অনেক বাঘ মেরেছেন। বাঘ, চিতা, কুমীর। শিকারী বলে সে অঞ্চলে তাঁর খ্যাতি ছিলো।

তিনি বললেন, ছাখ ছোকরারা, কথা কইবিনি। যেমন বসতে বলব, চুপচাপ তেমন গাছের ডালে বসে থাকবি। বাঘ মরে গেলে যখন বলব, তখন গাছ থেকে নামবি। হিসি-ফিসি করতে হয়তো এখনই করে নাও। জল খেতে হয়তো তা-ও। গাছের ডালে বসে নট নড়ন-চড়ন, নট-কিছু। মশা কামড়ালে মারতে পারবে না। কান চুলকোলে কানে হাত দিতে পারবে না, একেবারে স্ট্যাচু হয়ে থাকতে হবে।

তখন বাঘ শিকারের উন্মাদনা। আমি আর কড়িদা বললাম,

নিশ্চয়ই জ্যেঠু, নিশ্চয়ই জ্যেঠু, আপনি যা বলবেন, তাই-ই করবো।

আমার কাঁধে গুলির থলি, তাতে ভর্তি গুলি। কড়িদার হাতে বন্দুক, কথা ছিল বাঘ এলে এবং জ্যেঠুর অনুমতি পেলে কড়িদা আমাকে আগে মারতে দেবে। তারপরেও যদি গুলিখেকো বাঘ না মরে, তাহলে কড়িদাও গুলি করবে।

আমরা শোভাযাত্রা করে সেই আমগাছের দিকে চললাম। রতুজ্যেঠু প্রথমে পাঁঠাটাকে ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁঠার পেছনে জোরে একটা লাথি মারলেন। পাঁঠাটা মুখ দিয়ে একটা কুঁক্ আওয়াজ করল শুধু, কিন্তু ব্যাঁ বলে ডাকলো না।

রতুজ্যেঠু বললেন, ব্যাটা জ্বালাবে।

মনসুর মিঞাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্টকে অন্য পাঁঠা আছে?

মনসুর মিঞা বললেন, পাঁঠা তো এ গ্রামের মানুষদের মধ্যে অনেকই আছে হুজুর, কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যিকারের পাঁঠা যাকে বাঘ দিয়ে খাওয়ানো যায়, সেরকম এটা ছাড়া আর আপাততঃ নেই।

রতুজ্যেঠু আগে গাছে উঠলেন বন্দুকটা আমাদের হাতে দিয়ে। উনি কিছুটা ওঠেন আর বন্দুকটার নল ধরে টেনে ওঠান। এই করে করে উনি বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে একটা জুতসই ডাল দেখে অন্য ডালে হেলান দিয়ে বসলেন আসন করে। কড়িদাও তড়তড় করে উঠে গেল। গ্রামের ছেলে সে। উঠে গিয়ে সে-ও ভালো জায়গায় গিয়ে বসল। আমি বন্দুকের কুঁদো ধরে উঁচু করে নলটা এগিয়ে দিলাম কড়িদার দিকে। কড়িদা নল ধরে টেনে নিয়ে বন্দুকটাকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর আমার ওঠার পালা।

যদিও ছেলেমানুষ, শরীর ছিপছিপে ; কিন্তু শহরের ছেলে। গাছে ওঠার অভ্যাস নেই। নীচ থেকে মুনসের মিঞা আমাকে বস্তার মতো ঠেলে দিতে লাগলেন আর ওপর থেকে রতুজ্যেঠু আর কড়িদা আমাকে দু-হাত দিয়ে ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে ওপরে তুললেন। এবং ওপরে তুলে একটা ফোঁকরের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। বসার সঙ্গে

সঙ্গেই একসঙ্গে বোধহয় গোটা পঞ্চাশ লাল পিঁপড়ে আমার পশ্চাদ্দেশে সজোড়ে কামড়ালো। বাবা গো! মা গো! করে আমি মুখ থুবড়ে লাফিয়েই পড়তে যাচ্ছিলাম।

বাঘ মারা যে কত কষ্টকর তখনও বুঝি নি। কড়িদা এবং রতুজ্যেঠু আমাকে কিছুতেই লাফিয়ে পড়তে দিলেন না।

বললেন, আরেকটু উপরে উঠে ডালে বোসো, ফোকরের মধ্যে পিঁপড়ে কেন, বিছে-টিছেও থাকতে পারে, সাপ থাকাও বিচিত্র নয়।

ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার আমার হয়ে গেছে। আমার পশ্চাদ্দেশ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কতখানি যে লাল হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতখানি তা বাড়ি গিয়ে দেখা ছাড়া উপায় ছিলো না। তবুও বাঘ মারার প্রচণ্ড উৎসাহে আমি উপরের ডালে উঠে যেমন বলা হলো, তেমন চুপ করে বসলাম।

মুনসের মিঞা চলে গেল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যাতারা উঠলো পশ্চিমাকাশে। জ্বলজ্বল করতে লাগলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উঠল চাঁদ। চাঁদের আলো ধীরে ধীরে জোর হতে লাগলো আর বাইরে আলো যত জোর হলো, ঝুপড়ি আমগাছের ছায়াটা ততই অন্ধকার হতে লাগলো। ফুরফুর করে হাওয়া দিতে লাগলো। গরমের দিন। নদী থেকে আসা চমৎকার হাওয়ায় শাদা পাঁঠাটা আরামে ঘুম লাগালো।

রতুজ্যেঠু ফিস ফিস করে বললেন, এ তো মহা বিপদ। এ পাঁঠা না-চেঁচালে বাঘ জানবে কী করে যে এখানে পাঁঠা আছে?

আমি ফিসফিস করে বললাম, কী করা যায়?

রতুজ্যেঠু বললেন, তোর থলিতে তো অনেক গুলি। তুই এক কাজ কর, পাঁঠাটাকে ঢিল মার গুলি দিয়ে।

বাঘ শিকারের জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমার যে কিছুমাত্র ভূমিকা আছে তা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে উঠলাম এবং থলে থেকে এল্-জি এবং বুলেট খপাখপ্ ধরে পটাপট্

ছুঁড়তে লাগলাম পাঁঠাটার মাথা লক্ষ্য করে।

যে-গুলি বন্দুকের নল থেকে নির্গত হওয়ার কথা তা হাত দিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে সহজে পাঁঠার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। তিন-চারটে গুলির মধ্যে একটা গুলি হয়তো পাঁঠাটার গায়ে লাগছিল। লাগামাত্র পাঁঠাটা একটা সংক্ষিপ্ত কুঁক্ আওয়াজ করছিল যেমন রতুজ্যেঠুর লাথি খেয়ে করেছিল। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত কুঁক্ ছাড়া ব্যাঁ-ব্যাঁ ইত্যাদি পাঁঠাজাতীয় শব্দর কিছুই সে করল না।

রতুজ্যেঠু বললেন, ক্ষ্যামা দে।

আমি আবার গুলির ব্যাগ বন্ধ করে ফেললাম।

সময় বয়ে যাচ্ছে। চারিদিক থেকে নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল দূরগুম্, দূরগুম্. শব্দ করে বুকের মধ্যে ধুক্পুকানি তুলে। গ্রামের কুকুর ডাকল, তারপর অনেকক্ষণ ভুক্ ভুক্ করে শব্দ করে সেও থেমে গেল।

দূরের নদীর বুক বেয়ে নৌকো যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় সে মহাজনী নৌকোর বাদামী পাল অতিকায় পাখির সাদা ডানার মতো যেন স্বপ্নের দেশে ভেসে চলেছিল। হয়তো উজান বেয়ে যাচ্ছিল নৌকোটা, তাই যারা গুণ টানছিল, তাদের গুণ টানার হুম্হুমানি অলস হাওয়ায় নদীর উপর দিয়ে ভেসে আসছিল আমাদের কানে।

বাঘের কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাঁঠারও নেই। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হলো রতুজ্যেঠু ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখটা বুকের উপর নুইয়ে পড়েছে। আর মাঝে মাঝে ফোঁৎ-ফোঁৎ করে আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজটা কিন্তু একেবারেই বেতাল নয়। দাদ্রা কি কাহারবা সে-কথা আজ আমার মনে নেই কিন্তু আওয়াজটা প্রতিবারেই বিশুদ্ধ তালে হচ্ছিল। আপাতত সে তালের সাথে বাঘের পৌঁছানোর সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ছিল বলেই মনে হলো।

এমন সময় সেই অন্ধকার ছায়ার মধ্যে অন্ধকারতর কী একটা জন্তুকে নড়তে চড়তে দেখা গেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর কোনো অবয়ব ছাড়া আরও নিশ্চিততর কিছু আমার চোখে স্পষ্ট হল না। কিন্তু সে জিনিসটা আস্তে আস্তে গোল করে ছায়াটাকে প্রদক্ষিণ করছিল।

হঠাৎ দেখি, পাঁঠাটা ঘুম ভেঙে ধড়্ফড়্ করে উঠে যে-খুঁটিতে সে বাঁধা ছিল, সেই খুঁটির প্রান্ত থেকে তার গলায় যতটুকু দড়ি ছিলো, সেই দড়ির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং ভীষণ উত্তেজিত হয়েছে। এবং ছায়াটা যেমন প্রদক্ষিণ করতে লাগলো গাছের ছায়াটাকে, পাঁঠাটাও তেমন তার বিপরীতে আস্তে আস্তে পিছু হটে হটে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো।

কড়িদা দেখতে পেয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু আমি বিলক্ষণ দেখলাম যে, চিতাবাঘ এসে হাজির। এক্ষুণি তাকে মারা দরকার। আমি তাই তাড়াতাড়ি রতুজ্যেঠুর হাঁটুতে হাত দিয়ে তাঁকে ঝাঁকিয়ে তুললাম।

আচম্কা ঘুম ভেঙ্গে রতুজেঠু বন্দুকটাকে কোলের ওপরে শোয়ানো অবস্থাতে রেখেই, দু'হাত দিয়ে চটাচট্, পটাপট্ হাততালি মেরে বললেন, হতভাগা! হতভাগা!

বলতেই, পাঁঠাটা এবং বাঘটা দুজনেই ভড়কে গেল।

ভড়কে গিয়ে বাঘটা একলাফে পালিয়ে গেল চাঁদের আলোয় ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে এক টুকরো অন্ধকার বিদ্যুতের মতো।

আর পাঁঠাটা, এই প্রথম পাঁঠামি না-করে প্রাণ বেঁচেছে, সেই আনন্দে ব্যা-এ-এ-এ করে ডেকে উঠল।

আমি ও কড়িদা যুগপৎ বললাম, কি হলো রতুজ্যেঠু?

রতুজ্যেঠু বললেন, ওটা শেয়াল।

কিছুই বলার ছিলো না। জ্যেঠু আমাদের গুরুজন। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখলাম, যে হতভাগা এসেছিল, সে শিয়াল নয়, সে মান্যগন্য বিরাট চিতাবাঘ।

সেই বিফল শিকার যাত্রার পর রাতে মুনসের মিঞার বাড়িতে

মোরগা এবং রুটি সহযোগে রাতের খাওয়া সমাপ্ত করে আমরা যখন হুড খোলা গাড়িতে চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে এসে তামাহাটে পৌঁছলাম, তখন তো গল্প শুনে তুমি রেগে অস্থির।

পিসেমশাইয়ের ওপরও তুমি রাগ করলে।

পিসেমশাই হাসতে লাগলেন গল্প শুনে। কিন্তু তুমি বললে, ঈস্‌স্‌, আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম যে আমার ছেলেকে নিয়ে রতুবাবু বাঘ মারতে যাবেন, তাহলে আমি কখনোই ওকে যেতে দিতাম না। আমি জানি, ও আর কড়ি বুঝি গ্রামেই থাকবে আর রতুবাবু একাই বাঘ মারবেন।

পিসেমশাই হেসে বললেন, বাঘ তো আর মরে নি, আপনার ছেলেও বেঁচে ফিরেছে। কাজেই বৃথা উত্তেজিত হয়ে লাভ কি?

॥ ১০ ॥

বাবার যেদিন বরিশালে বদলীর অর্ডার হলো, মনে আছে, আমি তোমার শোবার ঘরে বসে, ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতে পড়ছিলাম। বাবা অবিভক্ত বাংলার একটা ম্যাপ নিয়ে এসে খাটের উপরে ম্যাপটা খুলে বসলেন।

বসে তোমাকে বললেন, বলো তো, এবার কোথায় যেতে হবে?

বদলীর কথা অনেকদিন থেকেই হচ্ছিলো, কিন্তু যেহেতু বাবা একটি আধা-সামরিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে যুদ্ধকালীন সময়ে বারংবার তিনি বদলীর অর্ডার হওয়া সত্ত্বেও তা নাকচ করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ গেছে থেমে, তাই সেবার সে-অজুহাতে আর বদলী এড়ানো গেলো না।

বাবা আঙ্গুল দিয়ে বাখরগঞ্জ সাব ডিভিশনের ম্যাপটি আমাদের দেখালেন।

ম্যাপে দেখলাম, সুনীল বঙ্গোপসাগর, আর যেখানে বাংলার মাটি শুরু হয়েছে, তার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ নদী নালা শিরা উপশিরার মতো ছড়িয়ে আছে। সেই জায়গাটুকুই বাখরগঞ্জ সাব ডিভিশন।

তুমি বাবাকে বললে, ওরে বাবা, অত নদী, অত নালা, নিশ্চয়ই কুমীর আছে, সাপ আছে; আমি যাচ্ছি না।

প্রথমে অবশ্য বাবা আমাদের নিয়ে যানও নি। প্রথমে উনি একাই গিয়েছিলেন।

তখন খুবই কষ্ট হতো বাবার একা থাকতে। সে কারণেই আমরা সকলে পরে গিয়ে বাবার সঙ্গে ছিলাম। বরিশালের সেই স্বল্পকালীন

অভিজ্ঞতা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাবার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন খুলনা। তিনি খুলনাতে সরকারী অফিসার ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে আমরা খুলনা অবধি গেলাম।

খুলনা স্টেশনে নেমে দেখলাম অদূরেই নদী। বিরাট বড় স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। স্টীমারের নাম বেলুচি। তার আগে অত বড় স্টীমার কখনও দেখিনি। গঙ্গার ঘাটে জাহাজ দেখেছি বটে, কিন্তু স্টীমার দেখিনি।

বাবার সেই বন্ধু আমাদের স্টীমারে চড়িয়ে চলে গেলেন শোলার টুপি নেড়ে। স্টীমার ছাড়লো বরিশালের দিকে। সে যে কী অভিজ্ঞতা!

সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকে আমরা বসে আছি ইজীচেয়ারে। একেবারে স্টীমারের সামনেটাতে ফার্স্ট ক্লাশ। তার বিরাট ডেক। তারপরই সেকেণ্ড ক্লাশ। চমৎকার খাওয়া দাওয়া। সেই স্টীমারের মুরগীর ঝোল আর ভাতের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। হু-হু করে হাওয়া ডেকময় ছুটে বেড়ায়। খবরের কাগজ পড়তে গেলে ফর্‌ফর্‌ করে কাগজগুলো উড়ে চলে যায়।

পরে যখন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' পড়ি, তখন স্টীমারের ডেকের বর্ণনায় এই বেলুচি স্টীমারের কথা বারবার মনে পড়তো।

এলাকে অন্তু বলছে, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলেম, আমার সর্বনাশ।' এই কবিতাটি মনে হলে যেন স্টীমারের ডেক, হু-হু হাওয়া, একাত্মভাবে মনে পড়ে যায় বারবার।

স্টীমার চলেছে। দু'পাশে জনপদ, বাংলার গ্রাম, নারকোল সুপুরী গাছ, গাঁয়ের ঘাটে মেয়েরা নাইছে, কতরকম নৌকো চলেছে নদী বেয়ে, আর স্টীমার চলেছে ঢেউ তুলে তুলে, যে-ঢেউ নদীর দুপাশের ঘাটে গিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে ভেঙে পড়ছে দুই কোণাকুণি রেখায়। কত কী স্টেশন!

পরদিন সকালবেলা ঝালকাঠি স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়ালো। তারপর আরো কত স্টেশন। এখন আর নাম মনে নেই।

বরিশালে অবশেষে গিয়ে পৌঁছালাম আমরা। তোমার সেই ভয়-ভয় আতঙ্কগ্রস্ত চোখ দুটোর কথা এখনও মনে পড়ে।

প্রথমে আমরা থাকতাম আমানতগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। যে-বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম, একতলায় দুটো ঘর ছিলো। তার পাশে ছিলো উঠোন। উঠোনের উল্টো দিকে ছিলো রান্না ঘর। এখনও ছবির মতো সব মনে পড়ে। সেই বাড়িটার কাছেই এক বিরাট পুকুর ছিলো। সে পুকুরের পাশে মাঝে মাঝে যেতাম বেড়াতে। সে-পুকুরে তুমি চান করতে দিতে না কখনও। সাঁতারও জানতাম না। কত লোক যে চান করতো। এক ঘাটে মেয়েরা, এক ঘাটে ছেলেরা। বড় বড় মাছ ঢাই দিতো জলের মধ্যে। ছোটো ছোটো ছেলেরা দূর দূর সাঁতার কেটে চলে যেতো, এমন কি মেয়েরাও। দেখে বড় হীনমন্য লাগতো।

আমানতগঞ্জ ছাড়িয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসের আরও ওপাশে আমার এক মাসীমার বাড়ি ছিলো। মাসীমার বাড়িতে ছুটির দিনে আমরা বেড়াতে যেতাম। দোতলা কাঠের বাড়ি। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঝক্‌ঝকে ডাবর থাকতো। প্রথম প্রথম সে ডাবরের তাৎপর্য বুঝতে পেতাম না।

প্রথমদিন তুমি তো শুনেই অবাক।

বললে, কি জংলী দেশে এসেছি রে বাবা!

তখনও বরিশালে খুব চুরি-ডাকাতি হতো, কথায় কথায় কাইজা লেগে থাকতো। এদিক-ওদিক হলেই রামদা দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতো। স্যানিটারী বাথরুমের চল তখন ছিলো না। বেশীর ভাগ গ্রামের বাড়িতেই বাথরুম থাকতো দূরে। ঐরকম চোর-ডাকাতের জায়গায় রাত্তিরে দরজা খুলে বাইরে বাথরুমে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতো না। তাই ছোট বড় সবরকম প্রাকৃতিক আহ্বানের

মোকাবিলা করার জন্যে প্রত্যেকের শোবার ঘরে বড় বড পেতলের ডাবর থাকতো। সে ডাবর রোজ ছাই দিয়ে মেজে ঝক্ঝকে করা হতো।

মাসীমার বাড়ির রান্নাঘর থেকে বসে নদীটা দেখা যেতো। পাশেই ছিলো বাগান, বাগানের পাশে বাঁধানো ঘাট, বড় পুকুর। পাশের বাড়ির সুন্দরী মেয়ে, জবা, আমারই সমবয়সী ; সে আসতো সাঁতার কাটতে। আমার মাসতুতো ভাই মিহির, সেও খুব ভালো সাঁতার কাটতো। আমরা শহুরে ছেলে-মেয়েরা ঘাটে বসে ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

জবা যখন তার দুধে-আলতা পায়ে ঢেউ তুলে তুলে সাঁতরে যেতো নিথর কালো জল, তখন আমার মনের ভেতর এমন এমন অনুভূতি জাগতো যে, তার ব্যাখ্যা তখন জানতাম না।

পরে বুঝেছিলাম, তাকেই বলে ভালো লাগা ; হয়ত একটু ভালোবাসাও।

জবা জলের মধ্যে সাঁতার কেটে কেটে নক্সী কাঁথা বানাতো আর ফোঁড় দিতো সেলাইয়ের, আর আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

একবার নদী থেকে একটা কুমীরের বাচ্চা চলে এসেছিলো সেই পুকুরে। সে কী কাণ্ড!

মাসীমার বাড়ির কাছে ছিলো এক নাম করা ময়রার দোকান। আমরা গেলেই মাসীমা তার কাছ থেকে গরম রসগোল্লা আনিয়ে দিতেন। সেই রসগোল্লার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মাসীমার বাড়ি সাইকেল রিকশা করে যেতে বাঁদিকে পড়তো বিরাট বাদা। হোগলার বন, হলদে-পাটকিলে রংয়ের হোগলা। বাদার মধ্যে থেকে কাম-পাখি ডাকতো। ছিটকে উঠতো সোজা উপরে মাছরাঙা পাখি। রোদ চমকাতো তার রঙীন ডানায়। বাদার জলের গন্ধ ডানায় মেখে বিকেলের নিস্তেজ রোদ সেই হোগলার পাটকিলে

রংয়ের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যেতো।

ক্যাঁচোর-কোঁচোর করে সাইকেল রিকশা চলতো, আর আমি তোমার পাশে বসে সেই গ্রাম্য প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আনন্দে বুঁদ হয়ে যেতাম।

আমানতগঞ্জ ছেড়ে তারপর আমরা কাঠপট্টির বাড়িতে উঠে যাই। কাঠপট্টির বাড়িতে বেশীদিন ছিলাম না। তারও পর আমরা সেই জর্ডন কোয়ার্টারে থাকতাম। বরিশাল জেলা স্কুলের পাশে, সুন্দর ছিম্‌ছাম্‌ পাড়া, চমৎকার লাল-রঙা সব বাড়ি। আগে সব সাহেব-সুবোরা থাকতেন।

জর্ডন কোয়ার্টারের বাড়িটা স্টীমার ঘাটের কাছে ছিলো। অন্ধকার রাতে নদীর বুক চিরে চলে-যাওয়া স্টীমারের সার্চলাইটের ঘূর্ণায়মান আলোর ঝলক আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে চমকে যেতো।

কাছেই ছিলো জেলা স্কুল। আমি যে-স্কুলে পড়তাম। বিরাট ছিলো তার মাঠ। কত ভালো ভালো বন্ধু হয়েছিলো আমার। আতাউর রহমান, মন্‌জুরুল করিম। কী সুন্দর ছিলো মন্‌জুরুলের চেহারা। পড়াশোনায় সে বড়ই ভালো ছিলো। একই দেশ, একই মানুষ। রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্‌টে গিয়ে আজ যে কত ব্যবধান হয়ে গেছে মন্‌জুরুলের সঙ্গে আমার। তখন মন্‌জুরুল গান গাইত — ইকবালের গানকে বদলে দিয়ে গাইত : সারে জঁাহাসে আচ্ছা পাকিস্তঁা হামারা হামারা, হামারা।

আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকতাম ওর দীপ্ত চোখেমুখে। মন্‌জুরুল যে এখন কোথায় আছে, কী করছে, কেমন আছে, কিছুই জানা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। উনিশশো সাতচল্লিশ সনে ক্লাস সিক্স-এ পড়তাম আমরা।

নদীর ঘাটে ইলিশ মাছের নৌকো এসে লাগতো। তিন-চার আনা করে টাট্‌কা ইলিশ পাওয়া যেতো। ইলিশের জাল যখন দিতো নদীতে, তখন কোনো পরিষ্কার সকালে লাফ দিয়ে উঠতে-থাকা রূপোলী

আঁশগুলো রোদে ঝিক্‌মিক্ করে উঠতো।

বরিশালের জমিদার ছিলেন মনোরঞ্জন বর্মণ। টকটকে তাঁর গায়ের রং। পরনে সব সময় ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী। সকালবেলায় পূজা পাঠ সেরে, বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে কানে মা-কালীর নৈবেদ্য দেওয়া ঝুম্‌কো জবা গুঁজে তিনি হুড্‌খোলা জীপ গাড়ি চালিয়ে আমাদের বাড়ি আসতেন।

বরিশালের অফিসারস্ ক্লাবে প্রথম টেনিস খেলা শিখি। বাবা একবার কোলকাতায় গেলেন কি কাজে। ফেরবার সময় ছোট্ট একটা র‍্যাকেট আমার জন্য নিয়ে এলেন। শিয়ালকোটে তৈরী।

মনোরঞ্জন কাকু বললেন, ভালোই হলো। তুমি শিখবে, তাতেই আমারও শেখা হয়ে যাবে।

নদীর পাশেই ছিলো অফিসারস্ ক্লাব। তাতে টেনিসের বাঁধানো হার্ড কোর্ট। স্কুলের ছুটির পর আমি সেখানে যেতাম টেনিস খেলতে। এবং যেহেতু আমি কিছুদিন আগে আরম্ভ করেছিলাম, মনোরঞ্জন কাকুকে আমিই ট্রেনিং দিতাম।

নদী থেকে হু হু করে হাওয়া আসতো, টেনিস কোর্টের নীলরঙা পর্দাগুলো হাওয়াতে নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠতো। গায়ের ঘাম সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে দিতো সেই হাওয়া।

হাটখোলার সেনবাবুদের বিরাট ব্যবসা ছিলো। তাঁদের অনেক মোটর বোট ছিলো। মাঝে মাঝে বাবা শিকারে নিয়ে যেতেন আমাকে। সঙ্গে অনেকে যেতেন। জজ সাহেব, অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অতিক্রম মজুমদার মশায়, আমাদের জেলা স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, মনোরঞ্জন কাকু, আরও কত লোক, এখন আর সেসব নাম মনে নেই।

দূরে চলে যেতাম আমরা নদী বেয়ে। শীতকালে হাঁস শিকার হতো অনেক সময় কুমীর। একবার মনে আছে, ভোলার কাছাকাছি চলে গেছিলাম। সে কী বিরাট নদী ; মনে হয় সমুদ্র। এপাশ-ওপাশ দেখা যায় না। মনে হয় সেই অকূল জলরাশির মধ্যে ছোট্ট বোটটি

এক্ষুনি ডুবে যাবে বুঝি।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট নদী-নালা ঘেরা শহরে তোমারও এক বিশেষ ভূমিকা তুমি গড়ে তুলেছিলে। তোমাকে সকলে ভালোবাসতো। কত লোক যে বৌদি বৌদি করে আসতো। আর তুমি সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে, সকলকে আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট করতে। সেই সব হাসিখুশী হৈ হৈ দিনগুলোর কথা বড় মনে পড়ে। তখন বাবার বয়সও কত কম ছিলো, তোমার বয়সও আরো কম ছিলো। আর আমরা তো ছোট্টই।

মানুষের জীবনে, মানুষের অপ্রাপ্তির স্বাদ-আহ্লাদ সবই হয়তো একদিন পূরণ হয়। অতৃপ্ত বাসনা কামনা সব, পরিপূর্ণভাবে পরিপ্লুত হয়, কিন্তু যৌবন চলে গেলে, আর তা ফিরে আসে না। এ-জীবনে যৌবনের বুঝি কোনো বিকল্প নেই। সমস্ত ধনসম্পদ, সমস্ত পার্থিব প্রাপ্তি দিয়েও যৌবনহীনতার গ্লানি ও দারিদ্র কিছুতেই ঢাকা যায় না।

একদিন আমরা পাখি শিকারে গিয়ে নদীতে বান আসার কারণে জীপ নিয়ে নদী পার হতে না পেরে রাতে এক গ্রামেই থেকে গেলাম। পরদিন বরিশালে ফিরে শুনলাম যে তুমি সারারাত ভয়ে বাবার রিভলবারের চামড়ার শূন্য খাপটি বালিশের নীচে নিয়ে জেগে শুয়েছিলে। চোর-ডাকাত এলে রিভলবারের হোলস্টার দেখিয়েই তাদের ভিরমী লাগাবে এমন মতলব করেছিলে!

বাবা হাসতে হাসতে এই গল্প সব বন্ধু-বান্ধবদের করে বেড়াতেন অনেকদিন।

আমরা বরিশাল থেকে ফিরে এলাম দেশ বিভাগের সময়ই। সরকারী চাকরীতে তখন হিন্দু, মুসলমান সবাইকে নিজ-নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভারতে বা পাকিস্তানে থাকার কথা জানাতে হলো উনিশশ সাতচল্লিশ সনে।

॥ ১১ ॥

বরিশাল থেকে ফিরে আসার দু'তিন বছর পরই বাবা সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেবেন বলে মনস্থির করলেন। সেদিনকার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। তখনও বেশ ছোটই ছিলাম।

বাবা একদিন এসে বললেন তোমাকে যে, সম্মানের সঙ্গে আর চাকরি করা সম্ভব নয়। এবারে চাকরিটা ছেড়েই দিতে হবে।

তোমার দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। মুহূর্তের জন্যে সে আতঙ্ক দু'চোখের মণিতে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠেই আবার প্রগাঢ় নিশ্চিন্তিতে স্থির হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি বললে যে, আমি কি অতসব বুঝি? তুমি যা ভালো মনে করবে তাই-ই করবে।

সে-রাতে বাবার মাথার চুল তিন-চতুর্থাংশ পেকে গেলো। চিন্তা-ভাবনায় মানুষের চুল পাকে; তা আগে শুনেছিলাম। কিন্তু চোখের সামনে এক রাত্তিরে যে মানুষের মাথার চুল এভাবে পাকতে পারে, তা বাবাকে না দেখলে জানতাম না।

স্বাধীনতার পর পর সরকারী চাকরিতে তখন সবে উন্নতির ক্ষেত্রে একে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার মহরৎ হয়েছে। তার আগে ব্রিটিশ আমলে "সুপারসেশান" শব্দটি তেমন পরিচিত ছিলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর পর বাবাকে দেখেছি বহু দেরী করে বাড়ি ফিরতে অফিস থেকে।

মা জিগেস করলে বলতেন এখন আমাদের নিজেদের সরকার, নিজেদের দেশ, এখন কি আর সময়ের হিসেব করে কাজ করলে চলে? অনেক বেশী কাজ করতে হবে, অনেক বেশী টাকা আদায় করে দিতে

হবে সরকারকে। কিন্তু বাবার এই আন্তরিকতা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ভালো সি-সি আর থাকা সত্ত্বেও কোনো দুর্বোধ্য কারণে তাঁর পর পর দু'বার উন্নতি আটকে গেল। এবং সে কারণেই বাবা চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিলেন।

তখন বাবার উপরওয়ালা ছিলেন মুখার্জিজ্যেঠু। ছোট-খাট মানুষটি। সব সময় ভারী রসিক, আমুদে এবং প্রাণচঞ্চল। তাঁর প্রত্যেকটা কথার নিদেনপক্ষে তিনটে করে মানে হতো। এরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি।

মুখার্জিজ্যেঠু বাবা এবং তোমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। উনি নিজে পরদিন বাড়িতে দৌড়ে এলেন। এসে তোমাকে অনেক করে বোঝালেন, মিসেস রায়, স্বামীকে বুঝিয়ে বলুন এরকম পাগলামী না করতে। দু'বার অন্যায় হয়েছে বলে কি চিরদিনই অন্যায় হবে? এবার নিশ্চয়ই প্রমোশন হবে। এইরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত ওকে নিতে মানা করুন!

তখন কাকারা কেউই কিছুই করেন না বলতে গেলে; মানে অর্থকরী কবা। রংপুরের বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই জলে যাবার উপক্রম দেশভাগের পর। দেশভাগ সবে হয়েছে। আমিই বাবার বড় ছেলে, তখন অত্যন্ত ছোট। ক্লাস সিক্সে পড়ি। আগেই বলেছি।

সে যাই হোক, বাবা সিদ্ধান্ত যখন নিলেন, তখন সেই মতোই পদত্যাগপত্র পেশ করে দিলেন। কোলকাতায় তখন এক নামকরা উকিল ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর প্রচণ্ড পসার, এবং তীক্ষ্ণধী মানুষ হিসেবে তাঁকে সকলেই সম্মান করতেন।

তিনি বাবার এই স্বাধীনচেতা এবং সাহসী মনোভাব দেখে বললেন, কোনো ভয় নেই রায়। তুমি আমার অফিসের বারান্দায় টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে পড়ো। ভালো করে যদি খাটো, তাহলে একদিন তুমি চাকরিতে যা রোজগার করতে, তার বহুগুণ বেশী রোজগার করবে নিঃসন্দেহে। তবে নিজের স্বাধীন পেশায় সততা ও পরিশ্রম সবচেয়ে বড় কথা।

বাবার স্বাধীন পেশার জীবনের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা বাবা বাড়ি ফিরলেন, সেদিন আমার জ্বর হয়েছিলো। আমি তোমার ঘরেই শুয়েছিলাম। বাবার পাশের ঘরে তোমার ঘর। বাবা এসে তোমাকে একটা একশো টাকার নোট দিলেন। দিয়ে বললেন, এই আমার স্বাধীন জীবনের প্রথম রোজগার, এই নোটটিকে সিঁদুর মাখিয়ে আলমারিতে তুলে রাখো।

তুমি তখনকার দিনের সেই বড় একশো টাকার নোটটিকে সিঁদুর মাখিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলে।

তারপর বাবার কাছে বলে বসলে, একটা কথা বলবো ?

বাবা বললেন, বলো।

তুমি বললে, তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কি মন্দ করলে জানি না। কিন্তু যাই-ই করো না কেন, আমি তোমার মতেই চিরদিন মত দিয়ে এসেছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, একটা কথা ভেবে আমার ভালো লাগছে, সে কথাটা এই, তুমি এতদিন যেহেতু সরকারী চাকরি করতে, কোনোদিন বাড়ি ফেরার সময় হাতে করে গঙ্গার ধার থেকে কিনে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এলে প্রতিবেশীরা আর বলতে পারবেন না যে, সরকারী চাকরি করে তো! সরকারী চাকরিতে কত কী উপরি রোজগার থাকে। বড় বড় মাছ তো ওরা খাবেই! এই অসম্মানের কথাটা যে আর কখনও শুনতে হবে না, এটা ভেবেই আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।

বাবার নতুন স্বাধীন পেশাতে বাবা দেখতে দেখতে অচিরে অত্যন্ত উন্নাত করলেন। কী যে অমানুষিক পরিশ্রম করলেন তখন বড় ছেলে হিসেবে বয়সে ছোট হলেও আমার পরিষ্কার মনে আছে। রাতে বাবা অনেকদিন বাড়ি ফিরতে পারতেন না। অফিসের টেবিলেই শুয়ে থাকতেন। তখন বাবার ছোট্ট অফিসে দু-তিনজন কর্মচারী ছিলেন! তাঁরাও অমানুষিক পরিশ্রম করতেন বাবারই মতো।

যখন তাঁদের ছুটি হতো, তখন শেষ ট্রাম, শেষ বাস, সব উঠে গেছে শহর থেকে। অতরাতে, বর্ষা বাদলে, কী প্রচণ্ড শীতের রাতেও চার-পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে হেঁটে তাঁদের নিজের নিজের বাড়িতে যেতেন। বাবার সেই নতুন অফিসের যে এ্যাসিসট্যাণ্ট এবং কর্মচারীরা ছিলেন, তাঁদের কাউকে কখনই দেখে মনে হয়নি যে, তাঁরা পয়সার বিনিময়ে কাজ করতেন।

তাঁরা সকলেই বৌদি বলতে অজ্ঞান ছিলেন। তোমার শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর হাসি, তোমার আন্তরিক ব্যবহার, স্নেহ মমতা যে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বলার নয়। আজকাল সেসব লোক আর দেখা যায় না। নির্মলকাকু, নরেনকাকু, শৈলেনকাকু, ইত্যাদি বাবার তৎকালীন সহকারীরা যেভাবে এবং যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতেন, সে আন্তরিকতা ও আপনারবোধ এখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল! তাঁরা কখনই একথা মনে করতেন না যে, টাকা রোজগারের জন্যে তাঁরা কাজ করতে এসেছেন। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, নাম হবে, যশ হবে, এটাই ছিলো তখন সবচেয়ে বড় কন্সিডারেশন। কার নিজের কতটা লাভ হবে এবং আদৌ হবে কিনা একথা তখনকার দিনে কম মানুষই হয়তো ভাবতেন।

আমাদের বাড়িতে তখন কাজ করতো ঊষা বলে একটি ছেলে। সে রান্না করতো না, তবে চা-জলখাবার দেওয়া, অন্যান্য ফরমাস-খাটা এসব কাজ তার ছিলো। আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসার আগে সে এক রেস্টুরেণ্টে কাজ করতো। অদ্ভুত কায়দায় দু'হাতে আট-দশ কাপ চা একের পর এক সাজিয়ে নিয়ে তীরবেগে সে দৌড়াদৌড়ি করতো বাড়িময়। তুমি তখন বলতে, ফেলে দিয়ে আসবাব পত্র তো নষ্ট করবিই, উপরন্তু ছ্যাঁকা খাওয়াবি কত লোককে।

তার যতরকম কৃতিত্ব ছিলো রেস্টুরেণ্টের চাকরিতে শেখা; ঊষা আমাদের কাছে সে-সমস্ত দেখিয়ে বাহাদুরী নিতো।

বাবার নতুন অফিসে একজন বেয়ারার দরকার। যে চা-জলখাবার

বানাতে পারে। উষাকে একদিন তুমি সে-কথা বললে।

উষা বলল, মা, আমার দাদা তো বসেই আছে কিছুই করে না, পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে, এখানে প্রায় না-খেয়েই রয়েছে। আপনি ওকে বাবুর অফিসে ঢুকিয়ে দিন।

পরের দিনই উষার দাদা বিশু, মার কাছে ইন্টারভিউ দিতে এলো। অতি ছোটখাট গুপ ধপে ফরসা, শাদা ধুতি শাদা শার্ট পরনে, মাথা-ভর্তি কোঁকড়া চুল, অত্যন্ত লাজুক মানুষ। কে বলবে যে উষার দাদা সে, একটু মেয়েলী মেয়েলী ও; এসে মার সামনে দাঁড়ালো।

তুমি বললে, বাঃ বেশ তো চেহারা! লেগে যাও তুমি কাল থেকেই বাবুর অফিসে।

রবিবার ছিলো বলে বাবা বাড়িতেই ছিলেন। বাবা তাকে ডাকলেন।

বললেন, তুই এর আগে কি করেছিস? কি কাজ করতিস?

বিশু বলল, ইস্মাগ্লিং।

বাবা বললেন, কি?

বিশু আবারো বলল, ইস্মাগ্লিং।

তুমি বললে, কি? তার মানে?

বিশু বলল, চাল আর চিনি লোকাল ট্রেনে এনে কোলকাতা শহরে বিক্রী করি। স্মাগলিং কথাটা তার আগে কোলকাতায় অত চালু ছিলো না। দেশবিভাগের পর যখন কর্ডনিং প্রথা চালু হলো এবং প্রচুর নিরুপায় বাস্তুহারারা এসে পড়ল এদেশে তখন থেকে বাঙালীর রক্তে একটি দুর্ভাগ্যজনক শব্দ ধমনী বেয়ে বইতে লাগলো। একটা উদার সংস্কৃতিসম্পন্ন হাসিখুশী সরল-সোজা জাতকে রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে এক অতি নীচ অথচ উপায়হীন পথে নেমে কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যে অনেক কিছুই করা আরম্ভ করতে হলো। অনেক কিছু অভাবনীয় ক্রিয়াকাণ্ডর সেই শুরু।

পুরোনো কথা মনে এলে অনেক কথাই মনে হয়। তোমার

স্মৃতিচারণের মধ্যে এসব কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক। তবু তোমার কথা মনে পড়তে পিছন ফিরে তাকালে অনেক অনেক কথা মনে আসে।

নরেনকাকু বাবার অফিসে কাজ করতেন। তিনি দেশবিভাগের পর বরিশাল থেকে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিলো না তাঁর, কিন্তু জীবনে খড়কুটোর মতো ভেসে-যাওয়া মানুষটির প্রধান সম্বল ছিলো কাজ শেখার ইচ্ছা। যে পায়ের তলা থেকে সব মাটি ধুয়ে গেছে, সেই পায়ের তলায় নতুন মাটি পাওয়ার ইচ্ছা। এইসব, এইসবই ছিলো তাঁর মূলধন।

তখন আমরা বরিশালেই কাঠপট্টিতে একটা দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। সেই বাড়ির উল্টোদিকে ছিলো একটি মনোহারী দোকান। সেই দোকান সকালে-বিকেলে এসে খুলতেন নরেনকাকু। সাইকেল-রিকশা করে এসে কালো মিষ্টি চেহারার এক ভদ্রলোক শাদা ধুতি ও হাত গোটানো শাদা শার্ট পরে এসে নামতেন একগোছা চাবি নিয়ে। তারপর সে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোকানের দরজার বিভিন্ন তালা খুলতেন। তালা খুলে দরজা ভাঁজ করে বাইরে দিকে খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঝুল-ঝাড়া ঝাড়ন দিয়ে দোকান পরিষ্কার করতেন: বাইরে একটু জলের ছিটে দিতেন, ভিতরে ধূপকাঠি জ্বালাতেন।

মনোহারী দোকান ছিলো। আমিও মাঝে মাঝে সে-দোকানে যেতাম সওদা করতে। ছোট্ট মফঃস্বল শহরে, সরকারী অফিসারের ছেলে-মেয়েদেরও সেই সময় বিশেষ খাতির হতো। একটা কাঠের টুল উনি আমাকে এগিয়ে দিতেন বসবার জন্যে। টেবিল ফ্যানটা মাঝে-মাঝে ঘুরিয়ে দিতেন আমার দিকে, তারপর সাবান কি অন্য কিছু যা কেনার জন্য আমি যেতাম, সেই সামগ্রী এগিয়ে দিতেন আমায়।

নরেনকাকু একটু একটু টাইপ জানতেন। সেই টাইপের জ্ঞানটুকু সম্বল করেই উনি যখন বরিশাল ছেড়ে কোলকাতা এলেন, তখন তাঁর দোকানের যিনি মালিক ছিলেন, বাবার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক, তাঁরই অনুরোধে বাবা নরেনকাকুকে অফিসে নিলেন।

সামান্য প্রতিষ্ঠানিক বিদ্যা সম্বল করে একজন মানুষ তাঁর পরিশ্রমের গুণে এবং তাঁর বড় হওয়ার জেদে যে কতখানি পথ এগিয়ে আসতে পারেন, নরেনকাকু তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। নরেনকাকু, নির্মলকাকুরা সকলেই যুক্ত ছিলেন বাবার কাজে কিন্তু তুমি আড়াল থেকে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলে তোমার অনন্যকরণীয় ব্যবহারে।

॥ ১২ ॥

তুমি আমার জন্য বরাবরই গর্বিত ছিলে। তোমার সেই গর্ব আমার ওপর এক গুরুভার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল তোমার গর্বের যোগ্য হওয়ার জন্যে। আমার সব কিছু নিয়েই তুমি গর্ব করতে। হয়তো করতে তোমার অন্য ছেলেমেয়ের ভালোটুকুও নিয়ে। কিন্তু যেহেতু আমিই প্রথম সন্তান, তোমার স্নেহ বিশেষভাবে ছিলো আমার ওপর।

আমি যখন বড় হয়েছি, যখন কোনো বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্নে যেতাম, যাবার আগে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে তোমাকে একবার সাজ না-দেখিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তা না-হলে তুমি আমাকে ডেকে পাঠাতে। বলতে, বাঃ, তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

সুন্দর হয়তো অনেককেই দেখায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য, সে শারীরিক বা মানসিক সৌন্দর্যই হোক না কেন এ্যাপ্রিসিয়েট করার লোক সংসারে নিজের মায়ের মতো অন্য কেউই থাকে না। তুমি আমার সবকিছু নিয়ে যেমন প্রীত এবং গর্বিত ছিলে তেমন এ জীবনে আর কেউই হবে না।

তোমার কথা যখন ভাবি, তখন একটা কথা সবচেয়ে বেশী মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, আর্থিক অবস্থার তারতম্য তোমার ভেতরের মানুষটিকে এতোটুকুও বদলাতে পারে নি। যে-তুমি তোমার বিয়ের পরে বেশ কয়েক বছর আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলে, সেই তুমিই অর্থের অশেষ প্রাচুর্য দেখে গেছ তোমারই জীবনে। কিন্তু যে দরদী, সমব্যথী, সরল এবং পরের দুঃখে কাতর মানুষটিকে আমি চিনতাম, সেই মানুষটিকে এতোটুকুও পরিবর্তিত দেখিনি অসীম প্রাচুর্যের মধ্যেও।

দারিদ্র বেশীর ভাগ মানুষকেই বড় হীনমন্য করে তোলে। এবং সেই দারিদ্র যখন নিজের জীবনেই প্রাচুর্যে পর্যবসিত হয়, তখন বেশীর

ভাগ মানুষই উচ্চমন্যতায় ভোগে। পুরনো জীবনের সব কথা ভুলে যায়। অনেকে পুরনো জীবনকে ঘৃণাও করতে শেখে, সে জীবনকে অস্বীকার করে বিস্মৃতির অন্ধকার গভীরে ঠেলে দেয়। সংসারে এর ব্যতিক্রম বড় একটা দেখি না।

কিন্তু তুমি ব্যতিক্রম ছিলে।

ছোটবেলাতেও যেমন দেখেছি, বড়বেলাতেও তেমন তোমার মনের অনেক দিক আমি নীরবে এবং নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া একদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, যখন আমাদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। সেই আত্মীয় ভারী চমৎকার মানুষ ছিলেন। অতি সুন্দরী, বিদুষী এবং গুণবতী। কিন্তু এদেশের বিবাহিতা মেয়েদের রূপ-গুণ কিছুই, একটা সময় পর্যন্ত স্বীকৃতি পেতো না, যদি-না তাদের স্বামীরা উপযুক্ত হতো। হয়তো এখনও স্বীকৃতি পায় না।

এমন যে মহিলা তাঁর স্বামী তাঁর উপযুক্ত ছিলেন না। যোগ্যতা যে ছিলো না তাঁর, তা নয়। অত্যন্ত কৃতবিদ্যমানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু রেসের মাঠে তিনি তাঁর সমস্ত যোগ্যতা কবরস্থ করেছিলেন। তিনি একদিন শীতের দুপুরে এলেন। তুমি এসে বিনুকে বললে, তোর আলমারিতে ক'টা শাড়ি-শায়া আছে?

বিনু বললো, কেন মা?

তুমি বললে, ও এসেছে শুধু শাড়ি পরে। ওর একটা শায়া পর্যন্ত নেই।

বিনু সেদিন আলমারি খুলে তোমাকে বলেছিলো, যতগুলো শাড়ি দরকার মা তুমি নিয়ে যাও।

তুমি নিজের শাড়িও দিতে পারতে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর রঙীন শাড়ি তুমি একেবারেই পরতে না, সে কারণেই তুমি মেয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলে শাড়ির ব্যাপারে।

তুমি যে কত লোককে সাহায্য করতে, কত লোক যে তোমার

মাসিক মাসোহারায় অভ্যস্ত ছিলো, তা শুধু জানা গেলো তোমার মৃত্যুর পরে। তুমি সবসময় বলতে, আহা! ওর কত কষ্ট! সে যেই হোক না কেন! তার কষ্ট লাঘব করার জন্য তুমি করতে না, বা করতে পারতে না এমন কিছুই ছিলো না। আমার হাত দিয়ে তুমি গোপনে কত লোককে কত কিছু দিয়েছো, কত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি আমি সাইকেল চালিয়ে টাকা পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছি ছোটবেলা, সেকথা এক তুমি জানতে আর আমি জানতাম। আজ অবধি বাবাও সেকথা জানেন না। কিন্তু যাদের কষ্টকে তুমি নিজের বুকের কষ্ট করেছিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই তোমাকে কষ্ট দিতে একটুও দ্বিধা করেন নি। সেসব চরিত্র বোধহয় এইরকমই হয়।

যে করে, তাকেই বোধহয় মানুষ পেয়ে বসে। যে ভালো, যে নরম, তাকে মানুষ শক্ত এবং খারাপ হতে বাধ্য করে ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়হীন অত্যাচারে ; তাদের বিবেকহীনতায়।

এ-পৃথিবী বড় অকৃতজ্ঞ পৃথিবী। তোমার মাধ্যমে, তোমার ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে এবং তার বদলে তুমি সংসার থেকে যা পেয়েছিলে, সেকথা বুঝে এই সিদ্ধান্তে আমার আসতে কোনো ভুল হয় নি।

দাবী এ-সংসারে কারো উপরেই অন্যের কিছুমাত্র থাকে না। কিছু লোক মনে করেন যে, যেহেতু কেউ পারেন, যেহেতু ভগবান তাঁকে অন্যদের চেয়ে ভাগ্যবান করেছেন, সে ভগবানেরই গুণ ; সেই হেতুই তাঁর বুঝি দায়িত্ব আছে ভাগ্যহীনদের ভার লাঘব করার।

এই বিশ্বাসে তুমি অনেকের দায়িত্ব হাসিমুখে বয়ে বেড়িয়েছো চিরটাকাল, সারাজীবন। অথচ খুব কমক্ষেত্রেই তার পরিবর্তে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা আমি দেখেছি, তাঁদের বেশীর ভাগেরই কাছ থেকে।

কোনো মানুষ যখন অন্য কারো জন্য কিছু করে, তখন তার মতো মানুষ হয় না। কিন্তু করতে করতে একটা সময়ে যখন বহুবিধ কারণে সেই করে-যাওয়াটা আর সম্ভব হয় না, সেই মুহূর্তে সেই মহৎ মানুষকে নীচ, স্বার্থপর, ইতর বলতেও সেই অনুগ্রহপ্রাপকদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

॥ ১৩ ॥

তর্পণ বা তিলাঞ্জলীর মন্ত্র জানি না আমি।

তাই, তোমার কথা বলতে বসে,তোমার স্মৃতিচারণ করতে বসে. কত কী যে এলোমেলো কথা মনে আসছে ভিড় করে। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে ; সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সান্ত্বনা এইটুকু যে, তবু তো তোমার কথা মনে করার মতো অবকাশ ও আনন্দ আমার আছে।

কোলকাতায় তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে. যে কারো উপর নির্ভর করে, বা যে কাউকে ভালবাসে, তার নির্ভরতা বা ভালাবাসার কখনও অমর্যাদা করতে নেই।

আমার বোন মিনু ছোটোবেলায় অনেকটা তোমার মতো ছিলো। বড় হয়েও সে অনেকানেক ব্যাপারে তোমার মতোই হয়েছে চেহারাতেও। তার ফর্সা রং, গোল গোল হাত পা, মিষ্টি মুখ সব মিলিয়ে ভারী সুন্দরী ছিলো সে।

মিনু বড় দাদা-ভক্ত ছিলো। আমার একটা ফেলে দেওয়া পুরনো নটি-বয় শু ব্লেড দিয়ে কেটে কেটে তাকে বাড়িতে পড়ার চটি বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি। সে চটি যে কত লোককে মিনু দেখিয়ে বেড়াতো তা কী বলবো। বলতো, দাদা দিয়েছে।

তখন বাটা কোম্পানী যে নটি-বয় শু তৈরি করতেন, সেইরকম জুতো আজকাল আর দেখি না। সে জুতো সমস্তরকম চেষ্টা করেও এক বছর প্রতিদিন পরেও ছিঁড়ে ফেলা যেতো না। স্কুলে যাতায়াতের পথে যাই-ই পেতাম, ডাবের খোলা, ইঁট পাটকেল সব কিছুতে লাথি মারতে মারতে যেতাম, যাতে তাড়াতাড়িতে জুতো ছেঁড়ে ; নতুন জুতো পাই! তবুও কি সে জুতো ছেঁড়ে! এতো অত্যাচার সয়েও সে

জুতো বছর ঘুরে এলেও ছিঁড়তে চাইতো না।

মিনুকে নিয়ে একদিন বাজারে গেছি, দুপুরবেলা গরমের ছুটির সময়ে। আমার হাতে-হাত ধরে, গুটি গুটি পা-ফেলে ছোট বোনটি আমার, আমার সঙ্গে গেছিল। খুবই ছোট ছিলাম, তবুও তখন থেকেই হয়তো জানতে পেরেছিলাম, যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ভয়-পাওয়ানোতে বা কম-বেশী পীড়ন করার মধ্যেও একটা তীব্র আনন্দ আছে। সে আনন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, সে-কথা এখানে অবান্তর। কিন্তু একজন আমাকে ভালোবাসে বলেই, আমার হাত ধরে সে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করে বলেই, তার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তার নিশ্চিন্ততা থেকে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে একটা ভীষণ মজা পেতাম।

এই মজার নেশায় মজে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অনেক কিছু হারাতে হয়েছে জীবনে।' কিন্তু খেলা মাত্রই হার জিতের। হারা অথবা জেতার মধ্যেই সব খেলার মজা। যে হারার ভয়ে ভীত হয় তার বোধ-হয় কোনো খেলাই খেলা হয়ে ওঠে না।

সে জন্যে আফশোষ নেই কোনো।

সারি সারি আলুর দোকান, বাজারে। তার পাশে ডিমের দোকান, সবজীর দোকান। মিনু একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিমের আর মুরগীর দোকানের সামনে খাঁচার মধ্যে মুরগীগুলোকে দেখছিলো।

তখন ও খুব ছোট ছিলো. হয়তো বয়স হবে পাঁচ কি ছয়। ও এতো মনোযোগের সঙ্গে মুরগীগুলো দেখছিলো যে, আমি সেই অবকাশে তাড়াতাড়ি ওর পাশ থেকে সরে গিয়ে আলুর দোকানের আড়ালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আমায় দেখতে না পেয়ে মিনু দাদা, দাদা, দাদা, করে কাঁদতে কাঁদতে এমন করে চারধারে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো যে, ওর নরম গাল বেয়ে জলের ধারা নামলো।

ওকে কাঁদিয়ে দারুণ এক নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছিলাম কিন্তু আমি তবু লুকিয়েই থাকলাম। যখন ও প্রায় ভয়ে পাগলের মতো দিশেহারা, তখন

আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে বললাম, এই মিনু, এইতো আমি !

আমাকে দেখতে পেয়ে রাগে, অভিমানে আনন্দে আরো জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মিনু দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমার এই ইচ্ছা করে হারিয়ে যাওয়ার কথা মিনু বাড়ি গিয়ে তোমাকে বলে দিয়েছিলো।

তুমি আমাকে বকেছিলে। বলেছিলে, এ অত্যন্ত অন্যায়।

তারপরেই তুমি জীবনে আমাকে প্রথম অভিশাপ দিয়েছিলে।

বলেছিলে, তুই কারুর ভালোবাসা ধরে রাখতে পারবি না।

সে কথার মানে তখন বুঝি নি। আজ অনেক বছর পেরিয়ে এসে, অনেক ভালোবাসা পেয়ে, অনেক ভালোবাসা হারিয়ে, অনেক ভালোবেসে তার বদলে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন স্বার্থপর শৈত্য বুকে বয়ে আজকে বুঝি যে, তোমার সেই অভিশাপ কত বড় সত্যি ছিলো।

এখনও মাঝে মাঝে ছোটবেলারই মতো ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে, এবং এক বা একাধিকজনকে হারিয়ে দিতেও ইচ্ছে করে।

কিন্তু একজন দায়িত্ববান প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে হারানো কখনই আর সম্ভব হয় না। পৃথিবী থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বে হারিয়ে গেলেও তাকে তার ঠিকানাতে ফিরে আসতেই হয়। ঠিকানার শিকলে আমি বড় মূক, নিরুচ্চার একঘেয়ে বাঁধা আছি ঘেউ-ঘেউ না-করা অবসর-প্রাপ্ত কুকুরের মতো।

আজ আর ইচ্ছা করলেই হারানো যায় না, ইচ্ছা না করলেও নয়।

এরকমই একটা অভিশাপ তুমি পরেও দিতে আমাকে, যখন আমি যুবক।

পড়াশোনা শেষ। জীবন সবে শুরু করেছি। যখন বহু বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা তাদের সুন্দরী গুণবতী কন্যাদের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করার জন্যে তোমাকে এবং বাবাকে অনুরোধ করছেন, অনবরত সেই সময় তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হতো।

তুমি সেই সময় বলেছিলে যে, তুই কোনো একজনকে নিয়ে জীবনে

কখনও সুখী হতে পারবি না। তোর বিয়ে করাই উচিত নয়। তুই আজকে যা চাস, তা পাওয়া হয়ে গেলে, তা অবহেলায় ধূলোয় ফেলে দিস। পরের দিনই নতুন কিছু চেয়ে বসিস তুই। এইরকম যার মন যে নিজে যাকে জানে না, যার নিজের মনের স্থিরতা নেই তার পক্ষে বিয়ে করা কখনই উচিত নয়। তোর কোনো অধিকারই নেই কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তাকে অসুখী করা।

বলেছিলে যে তুই সুখী হবি না জীবনে।

তখন আমি জানিনি কিন্তু পরে জেনেছিলাম যে, মায়ের আশীর্বাদের মতো, অভিশাপও জীবনে ফলে।

তুমি মা, তাই হয়তো আমাকে বুঝেছিলে। গুণে এবং দোষে।

এর পরে সেই তুমিই, হয়তো মা বলেই বহুদিন আমাকে বলেছিলে : পরজন্মে যেন তোর মতো স্বামী পাই। কেন যে সে কথা বলতে তা তুমিই জানতে।

এর মানে এই নয় যে তুমি তোমার নিজের বিবাহিত জীবনে কোনোরকম অসুখী ছিলে। কিন্তু হয়তো এর মানে এই যে, অন্যের প্রতি যা সহানুভূতি, সমবেদনা এবং যা-বোধ আমার বুকে জমা করে রেখেছিলাম, পরিবর্তে কিছু পাই আর নাই-ই পাই ; সেই রকমের অনুভূতি হয়তো তোমাদের যুগের সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পুরুষদের মধ্যে সচরাচর অনুপস্থিত দেখা যেতো।

তা ছিলো সে যুগের প্রকৃতি।

জীবনে কোনো মানুষই সম্পূর্ণ সুখী হয় না। প্রত্যেক সুখেরই, চাঁদেরই মতো হয়ত দুটি পিঠ থাকে। বিশেষ কোণ থেকে দেখলে, এক বিশেষ বেলায় সেই সুখের এক পিঠে আলো পড়লে তাকে সুখ বলে মনে হয়। আবার অন্য কোণ থেকে দেখলে পড়ন্ত বিধুর গোধূলির আলোয় তাকে দেখলে তাকেই আবার অসুখ বলে মনে হয়।

জীবনের মধ্যেই সুখ দুঃখ সব কিছু মাখামাখি হয়ে, জড়াজড়ি করে থাকে।

তুমি কখনো বিষণ্ণ বোধ করলে একটা গান গাইতে নিজের মনে। গানটা ছিল টপ্পার কাজের গান। জানি না, নিধুবাবুর টপ্পা কিনা। খালি গলায়ও তুমি গাইতে। পরবর্তী জীবনে অর্গান বাজিয়ে গাইতে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বেশীর ভাগই ব্রহ্ম সঙ্গীত! কিছু অতুলপ্রসাদের গান। কিন্তু আজকেও সেই বিশেষ গানের কলিগুলো অস্পষ্ট মনে পড়ে বারবার ফিরে ফিরে।

সেই কথাগুলির গভীরতা, ছেলে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করার বুদ্ধি আমার ছিলো না। কিন্তু এই পরিণত বয়সে পৌঁছে হৃদয়ঙ্গম করি কী গভীর সেই কথাগুলি। টপ্পার কারু কাজ ভরা গানটি বিস্তার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমে পৌঁছতে অনেক দেরীতে এসে।

তুমি গাইতে—

"আমি সুখী হলে তুমি সুখী হও;
তথাপি সুখের লাগিয়া হেথা রও!
সুখের উপরে দুখ, যার দুঃখ তার সুখ।
আমি অপরাধী ওগো, অপরাধী;
তবু আমারে চাহিয়া সুখী হও!
আমি দুখী হলে তুমি সুখী হও।"

বোনেদের পরে আমাদের এক ভাই ছিলো তার নাম বাবলু। দেখতে সে বিশেষ ভালো ছিলো না। কালো-কোলো, নাক চোখও খুব একটা তীক্ষ্ণ নয়; কিন্তু সে বড় শান্ত ভালো ছেলে ছিলো। কী মিষ্টি করে দাদা দিদি বলত। আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত!

একদিন স্কুল থেকে ফিরেছি। ফিরেই শুনলাম, বাবলুর বসন্ত হয়েছে। তখনকার দিনে বসন্ত, আসল বসন্ত বড় সাংঘাতিক অসুখ ছিলো।

মা বাবলুকে নিয়ে মধ্যের ঘরে থাকলেন সেদিন থেকে। বাবাও সে-ঘরেই রইলেন। বোনেরা বাইরের ঘরে চলে এলো।

'কবিরাজ মশাই এলেন, কলাপাতায় মাখন নিয়ে। সেই মাখন

বাবলুর সারা গায়ে কী এক প্রক্রিয়ায় লাগিয়ে দিলেন। সারাদিনই প্রায় নিমপাতা আর গন্ধক পোড়ানো হতো। তার তীব্র কটু গন্ধে নাক ভরে থাকতো আমাদের। অনেক ওষুধ-পত্র।

· সে বছরে ছোটোদের কোনো পুজো সংখ্যায়, একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, গল্পটির নাম এতবছর পরে মনে নেই। কিন্তু তার মধ্যে একটা গল্পের একটা লাইন ছিলো: মানুষ মরণশীল।

তখন থেকেই পড়ার বইয়ের চেয়ে বাইরের বই-ই বেশী পড়তাম। তবে বাইরের বই পেতাম না বেশী। আমাদের বাড়ির পাশেই একটি বইয়ের দোকান ছিলো, সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো আমার বড় মামা। দোকানদারের একটি চোখ ছিল পাথরের। তাঁরই দয়ায় দোকানে গিয়ে গোগ্রাসে বই পড়তাম। অনেক সময় উনি বলতেন, নিয়ে যাও, মলাট দিয়ে পড়ে আমাকে আবার ফেরৎ দিয়ে যেও। তাই বইয়ের, বিশেষ করে বাংলা বইয়ের অভাব হতো না।

বাবলুর অসুখের মধ্যে, একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিন, বাথরুমে আঁচাতে আঁচাতে হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠেছিলাম মানুষ মরণশীল।

এই লাইনটা আমার মাথায় ছিলো! কেন ছিলো এবং কেনই বা খেয়ে দেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে আমার মনে পড়ে গেছিল এবং মনে পড়ে গেলেও কেন যে তা জোরে জোরে বলেছিলাম, সেকথা সেদিন যেমন জানিনি, আজও জানি না।

তার ঠিক তিনদিন পরেই রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় বাবলু আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সন্ধ্যে থেকেই অবস্থা খারাপ হয়েছিল। বাবা – কাকাদের দৌড়োদৌড়ি হুটোপাটি ডাক্তার কবিরাজ সবরকম চেষ্টা, এবং ঠাকুমার ক্রমাগত হরির নামের মধ্যেই বাবলু চলে গেল।

মা ভীষণ কাঁদতে লাগলেন।

বাবা আমাদের ডেকে বললেন, তোমরা বাবলুকে দেখে যাও, আর

দেখতে পাবে না।

আমরা তিন ভাই বোন ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে মধ্যের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

বাবলুকে আর দেখতে পাবো না এ-কথা তখন ভাবার মতো বুকের জোর ছিলো না। দেখি সেই হাসিখুশী ভাইটি আমাদের, মুখটা কীরকম যেন হয়ে গেছে, সমস্ত মুখটা ফুলে ফুলে উঠেছে, চেনা যাচ্ছে না বাবলুকে। শরীরটা কীরকম ছোট্ট হয়ে গেছে। তুমি ওকে বুকে নিয়ে ভীষণ কাঁদছো।

তুমি কিন্তু মা কোনোদিনও জোরে কাঁদতে না। তোমাকে কোনোদিনও জোরে কাঁদতে দেখিনি। তোমার মুখ দিয়ে দুঃখের অভিব্যক্তি যদি প্রকাশিত হতো তা খুব কম লোকই শুনেছে।

তুমি কাঁদছিলে, তোমার মুখ হাঁ হচ্ছিলো, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছিলো একটা অব্যক্ত শব্দও হচ্ছিলো, কিন্তু তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছুই বলছিলে না।

কিছুক্ষণ পর বাবা-কাকারা বাবলুকে নতুন কাপড়ে জড়িয়ে "বল হরি হরিবোল" করতে করতে কেওড়াতলার দিকে নিয়ে গেলেন।

আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

তার পরদিন সকালে তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে।

সে-ঘরে তখনও নিমপাতা ও গন্ধকের পোড়া গন্ধ, ওষুধ-বিষুধ কবিরাজী টোট্‌কা সব পড়ে রয়েছে! বাবলুর ছোট ছোট প্যাণ্ট, জামা, ওর ছোট চটি, সবই আছে, সব।

শুধু ও-ই নেই।

মা বললেন, খোকন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

আমি বললাম, বলো।

মা বললেন, তুই পরশুদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বললি কেন যে, মানুষ মরণশীল?

আমার বুকটা হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠলো। আমারই কোনো

অপরাধে হয়তো বাবলুর মৃত্যু হলো! কেন বলতে গেলাম একথা? আমি কেন হঠাৎ না জেনে না বুঝে একথা জোরে বললাম, আর তার এতো পরেই বা কেন বাবলু চলে গেল?

আমি ভাবলাম, আমাকে বাবা-মা হয়তো খুবই বকবেন! হয়তো আমাকেই বাবলুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করবেন।

দারুণ ভয় পেয়ে বললাম যে, না মা, তোমাকে দেখাচ্ছি। একটা বইয়ে পড়েছি মা। এখুনি বইটা আমি নিয়ে আসছি।

বলেই, দৌড়ে আমি পাশের ঘরে গিয়ে, সেই বার্ষিক সংখ্যাটি থেকে, সেই গল্পটি বের করে মা ও বাবা দুজনকেই দেখালাম।

কার লেখা গল্প, সেটি আজ আর মনে নেই। বোধহয় খগেন মিত্র মহাশয়ের এবং মানুষ মরণশীল একথা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল, তাও বোধহয় মনে নেই। কিন্তু মানুষ যে মরণশীল একথা আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে এমন করেই সেদিন বুঝেছিলাম যে, পরে সে সম্বন্ধে আর কোনোরকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিলো না।

প্রত্যেক মানুষকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হয় রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শভরা এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত আমরা কী আশ্চর্যভাবে এই কথাটা ভুলে থাকি!

তুমি নিজেও যখন ছিলে তখন এক মুহূর্তের জন্যে কোনোদিনও মনে হয়নি যে, তুমি একদিন সত্যিই থাকবে না। মা বাবা যে চিরদিনই থাকেন না, একথা মা বাবা থাকতে বোধহয় কোনো ছেলে মেয়ের মনে একবারও আসে না।

স্মৃতি, কত সব সুন্দর দিন! কত হাসি কত গল্প কত ছোট বড় ঘটনা, সব ফিরে ফিরে মনে আসে তোমাকে ঘিরে।

কোলকাতায় বোমাপড়া আরম্ভ হলো। একদিন বাইরের ঘরের দরজা খুলে সেজকাকুর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, উদীয়মান সূর্য-আঁকা জাপানী প্লেনগুলো গোঁ গোঁ করে ঘুরে ঘুরে কোলকাতার মাথার ওপর চক্কর মারছে। বোমাও পড়তে দেখলাম সকালের পরিষ্কার রোদ্দুরে।

চিক্‌চিক্ করে উঠছিল রোদে, উপর থেকে যখন আস্তে আস্তে পড়ছিল বোমাগুলো।

বিকেলবেলা শোনা গেল খিদিরপুরে অনেক বোমা পড়েছে। খিদিরপুরে ডকে। কোলকাতা থেকে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। যাঁদের না থাকলেই নয়, ব্যবসা অথবা চাকরির কারণে ; শুধুমাত্র, তাঁরাই রয়ে গেলেন কোলকাতার বুকে। জমি বাড়ি সব জলের দামে বিক্রী হতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো, জাপানীরা এসে পড়লো বলে ! সেইসময় বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন রংপুরে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে।

॥ ১৪ ॥

তোমার ছোটবেলা কেটেছিলো বিহারের এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙালী-গরিষ্ঠ শহরে। জলে ভয় পেতে তুমি। গ্রাম কাকে বলে জানতে না। তোমার সাপের ভয়, বিছের ভয়, এমন কি ভয়, টাকা-কেন্নোতেও। সেই যে বড় বড় বাদামী কেন্নোগুলো, টোকা মারলে টাকার মতো গোল হয়ে যেতো, সেগুলো দেখলেই তুমি কী আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতে। আর ভয় ছিলো তোমার আরশোলাতে। সেই তুমিই ইভাকুয়েশানের সময়ে কোলকাতার পাট চুকিয়ে রংপুরের বাড়িতে আমাদের নিয়ে থাকতে ঘোমটা টেনে, কতরকম গ্রাম্যতা মানিয়ে নিয়ে।

রংপুরের বাড়িতে চারটে ঘর ছিলো। যে ঘরে আমরা থাকতাম তাকে বলা হতো বড় ঘর। তারই নীচে বাঁশের ধারার ফল্‌স্‌-সিলিং। টিনের দেয়াল, তার মধ্যে অনেক ফুটো-ফাটা। তবে ভিত ছিলো সিমেণ্টের। মাটি থেকে অনেক উঁচু করে বাঁধানো। সে ঘরে আমরা ভাই বোনেরা, তুমি, আর ঠাকুমা শুতাম। সেই বড় ঘরের উণ্টোদিকে ছিলো রান্নাঘর, মাটির ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির-দাওয়া, মাটির সিঁড়ি। রান্নাঘরের ডানদিকে যে ঘর ছিলো, তাতে থাকতেন বড়কাকু, তিনি বিয়ে করেননি। বড়কাকুর ঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটি ঘর। সেটি ছিলো ঠাকুমার ঠাকুরঘর।

বড়কাকুর ঘরের উণ্টোদিকে ছিলো বাইরের ঘর। সেটিতে একপাশে বসার বন্দোবস্ত, অন্যপাশে ঢালাও তক্তপোশ পাতা। একসঙ্গে দশজন এসে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই।

সেই বাইরের ঘরের সামনেটায় ছিলো প্রকাণ্ড গোলাপফুলের বাগান। কত যে গোলাপ ফুটতো, সে বলার নয়। দূর দূর জায়গা

থেকে লোকে আসতো সে গোলাপ বাগান দেখতে। বাগানের সামনে দিয়ে লাল মাটির পথ চলে গেছিল। একদিকে খোঁয়াড়, শংকামারীর শ্মশান; অন্য দিকে শহর, ডিমলার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে, জেলা স্কুলের সামনে দিয়ে।

গোলাপ বাগানের পাশ দিয়ে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রায় পাঁচ-ছ' কাঠা চওড়া আর বিঘে খানেক লম্বা ফালি জমি ছিলো, সে-জমি বেয়ে এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হতো।

সে জমির বাঁদিকে ছিলো বাগান, বিরাট বাগান, গোল কাঁঠালের গাছ, জলপাই গাছ; কতরকম আম।

শীতকালে হলুদ জলঢোড়া সাপ রোদ পোয়াত সে বাগানে। সেই বাগান যেখানে শেষ হয়েছে তার পরে ছিলো আলুক্ষেত। সেও বিরাট। একপাশে দাঁড়িয়ে অন্য পাশ অবধি চোখ পৌঁছতো না। সেই আলুক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে গেছিল ইরিগেশান্ ক্যানেল। সেই ক্যানেল গিয়ে পড়েছিল ঘোঘোট নদীতে; আর সেই নদী গিয়ে পড়েছিল তিস্তায়।

বর্ষায় যখন বান আসতো তিস্তা নদে, ঘোঘোট নদী ভরে উঠতো জলে। আর ঘোঘোটের জল উপছে যেতো ক্যানেল বয়ে। ক্যানেলের জল এসে পুকুর দিতো ভরে, বাদামী-কালো ডাহুক ডাকতো সারাদিন ছায়াচ্ছন্ন পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে, তাদের শ্যাওলা শ্যাওলা শরীরে কাঁপন তুলে। সাদা-বাদামী বকগুলো ঠায় একপায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতো আর কত কী ভাবতো। বকেরা সারাদিন কী যে অত ভাবে, ভাবতাম আমি।

বাড়িতে ঢোকার রাস্তায় দুপাশে দুটো কাঠটগরের গাছ ছিলো। বড় গাছ। যখন ফুল ফুটতো গন্ধে ম' ম' করতো চারপাশ। হাসনুহানার ঝোপ ছিলো, ছিলো বাতাবীলেবুর গাছ। কাগজীলেবুর গাছ। রান্নাঘরের পেছনে অনেকখানি অব্যবহৃত জমি। তাতে মানকচুর ঝাড়, আশে পাশে গজিয়ে উঠতো বর্ষার দিনে কতরকম ব্যাঙের ছাতা।

টক পাতার গাছ। কখনও কখনও বা সে ছাতার নীচে ধ্যান গম্ভীর ছাই রঙা ব্যাঙ থাকতো বসে।

সেই ফালি জমিটুকুর পাশে ছিলো কুঁয়োতলা। বিরাট বাঁধানো কুঁয়ো। কুঁয়োতলার গা ঘেঁষে একটা সিঁদুরে আমের গাছ। কালবোশেখীর ঝড় উঠলেই ধপাধপ্ আম পড়তো ঝরে। কী তাদের রং। যেন কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে।

বড় ঘরের ডানপাশে ছিলো ঠাকুমার হবিষ্য ঘর। মাটির উপরে শন ছাওয়া। তার পাশে ঢেঁকিঘর। তারই পাশে গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে থাকতো ফুলমণি গাই আর তার বাছুর। গোখরো সাপ এসে কখনও কখনও ফুলমণির পা জড়িয়ে ধরে ফুলমণির দুধ খেয়ে যেতো চুরি করে। রাতের বেলায় আসতো বাদুড়ের ঝাঁক। লিচু গাছে লিচু খেয়ে যাবার জন্যে। তখন বাদুড় তাড়াবার জন্যে লিচ্‌গাছে কেরোসিনের টিন বেঁধে তাতে লাঠি ঝুলিয়ে, লাঠির দড়ি ধরে টানাটানি করতো সারারাত আমাদের নেপালী দারোয়ান বাহাদুর। বাদুড় তাড়াবার জন্য।

কাঁঠাল গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়তো মাটিতে — শান্ত, পাখি-ডাকা কাঁচপোকা ওড়া দুপুরে গোবর নিকোনো উঠোনে। কত তাদের রং। সোনালী, গাঢ় বাদামী, হলুদ। গরমের দুপুরে হাওয়ার গন্ধ, মাঠের গন্ধ, পাতার গন্ধ, গোবর-নিকোনো উঠোনের গন্ধ, হলুদ বসন্ত পাখির গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে যেতো।

শেষ-বিকেলে ঢেঁকিতে পাড় দিতে তুমি। এখনও মনে পড়ে, তোমার সেই ছিপছিপে সোনারঙা চেহারা, লাল পেড়ে শাড়ি পরেছো তুমি, তোমার লক্ষ্মীমন্ত পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে শাড়ির পাড়, আর ঢেঁকির একপ্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে আছো ওপরে ঝোলানো দড়ি ধরে। আর নামছো উঠছো, উঠছো নামছো।

চিড়ে কুটতে কখনও। শব্দ হতো বুক্ ধুক্ ; ধুক্ বুক্। তালে তালে স্বর মিলিয়ে সেই বাদামী লেজ-ঝোলা বড় পাখিটা বাইরের

বাগানে ডেকে চলতো গুব্ গুব্; গুব্ গুব্।

কোলকাতা থেকে বাবা তোমাকে চিঠি লিখতেন নীল রঙের খামে, মোটা মোটা চিঠি। বিকেলে চান করে, চুল বেঁধে, সিঁদুরের টিপ পরে, তুমি বারান্দার এক সিঁড়িতে বসে অন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে চিঠি পড়তে।

চিঠি পড়তে পড়তে তোমার মুখের ভাব সেই সুন্দর সুগন্ধি বিকেলের মতো নরম হয়ে উঠতো। কত কী পাখি ডাকতো চারদিকে।

আস্তে আস্তে আকাশের রং গোলাপী হয়ে যেতো। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকতো, তখন উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ো দেখা যেতো। আমি হু-হু হাওয়ায় খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে স্বর্গসরণীর সাদা মেঘপুঞ্জর সঙ্গে মিশে-যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপোলী চুড়োর উপরে শেষ সূর্যের গোলাপী রঙের খেলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠতাম।

কখনও কখনও তুমি রাঁধতে বসতে রান্নাঘরে। সামনে কুপী জ্বলতো। কিন্তু উনুনের আগুনের আভায় রান্নাঘর ভরে থাকতো: উনুনের সামনে বসে তোমাকে দেখাতো দেবী প্রতিমার মতো উজ্জ্বল।

ক্ষেতের লাল মিষ্টি চালের ভাতের গন্ধ ভাসতো মন্থর সান্ধ্য গ্রাম্য হাওয়ায়, শেয়াল ডাকতো ক্যানেলের ধারে, পেঁচা আর বাদুড় ঝুপ-ঝাপ করতো ঝোপে-ঝাড়ে। নির্জনতাকে চমকে দিয়ে তক্ষক ডাকতো নারকোল গাছের গোড়ার ঝোপ ঝাড় থেকে।

বাবা যখন কোলকাতা থেকে মাঝে মধ্যে আসতেন দু-তিনদিনের জন্যে, তখন বলতেন যে, ভাতের ফ্যান মোটে গাল্‌বে না। ফ্যানের মধ্যে কত ভিটামিন! কোলকাতায় কত লোক একটু ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও মা বলে কেঁদে মরছে।

কিন্তু তুমি রোজই সে কথা ভুলে যেতে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাতের ফ্যান গাল্‌তে। বাবা পিচ্‌বোর্ডের উপরে কাগজ সেঁটে তাতে বড় বড় করে লিখে দিয়েছিলেন "ভাতের ফ্যান গালিবে না," এবং সেই পিচ্‌বোর্ডের লেখাটা উনুনের পেছনের দেয়ালে, বাঁশের খুটিতে পেরেক

দিয়ে মেরে দিয়েছিলেন। রান্না করার চৌকিতে বসে সে লেখাটা যাতে চোখের সামনেই থাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি দু-একদিন ভুলে যেতে ভাতের ফ্যান গালতে।

রান্নাঘরের পাশে যে কাগজীলেবুর গাছটা ছিলো, সেই লেবুতে এতো রস হতো যে, বাহাদুর বলতো "কুঁইয়া কা পানি।" সেই লেবুর গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে।

ক্ষেতের চালের ভাত, ক্ষেতের আলুভাজা, আর তাতে কাঁচা লঙ্কা ডলে আর সেই লেবু চিপে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে মাটির রান্নাঘরে বসে যে ভাত খেতাম সে ভাতের স্বাদ পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শহরের শ্রেষ্ঠতম হোটেলের খাওয়ার ঘরে বসেও পাই না।

রংপুরে বড় মাছ বিশেষ পাওয়া যেতো না। তুমি আবার ছোটো মাছ একেবারেই খেতে পারতে না। ছোটো ছোটো পুকুরের কুচোকাচা মাছ, গরমের দিনে কৈ, শিঙি পুকুর-ছেঁচা; শীতকালে পুঁটি, খয়রা, বাটা এইসব। তুমি রেঁধে দিতে, বড় ভালো রান্না করতে তুমি; কিন্তু সেই ছোটো মাছ খেতে পারতে না কখনও। খেলেও, ভালোবেসে খেতে না।

খাওয়ার কথা উঠলে কত কথাই যে মনে পড়ে, শীতের কি বর্ষার রাতে তোমার ভুনি খিচুড়ি, সেই খিচুড়ি রান্না তুমি শিখেছিলে দিদিমার কাছ থেকে।

দিদিমা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন। গিরিডিতে প্রতি সপ্তাহে তাঁর গুরু ভাইরা এসে জমায়েত হতেন বাড়িতে। বিকেলে মোহনভোগও হতো। সেইরকম মোহনভোগও তুমি আমাদের রেঁধে খাওয়াতে। এমন মোহনভোগ আর কখনও খাবো না। কড়া করে সুজি ভেজে, ভালো করে ঘি ঢেলে, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে কী অপূর্ব মোহনভোগ যে তুমি রাঁধতে, সে যে না খেয়েছে, তার পক্ষে বোঝাই মুশকিল।

খিচুড়িতে কড়াইশুঁটি দিতে। ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি। বেশী পাতলাও নয়; আবার খুব ঘনও নয়। কী যে তার স্বাদ। সঙ্গে

শুকনো লঙ্কা ভাজা, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, ডিম ভাজা। তোমার খিচুড়ির গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। কত জায়গায়ই তো খিচুড়ি খাই, কিন্তু অমন খিচুড়ি আর কেউই রাঁধতে পারে না।

আর তোমার কড়াইশুঁটির চপ? কিভাবে যে করতে, তা তুমি একাই জানতে। যাওয়ার আগে কাউকে একটু শিখিয়েও গেলে না! তুমি আমাদের ভালোবাসতে না ছাই! ভালোবাসলে মানুষ ভালো-বাসার জনদের এমন করে হঠাৎ ফেলে চলে যায়?

কড়াইশুঁটির চপের পুরটার একটা আলাদা বিশেষত্ব ছিলো, আর বিশেষত্ব ছিলো চপের উপরের আবরণের। সেই চপ যেই-ই খেয়েছে আমাদের বাড়াতে, সেই-ই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে তোমাকে বলতাম, পড়াশুনা করে আর কী হবে, তোমার চপের রেসিপিটা শিখিয়ে দাও, একটা দোকান দেবো রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ে, খালি এই চপেরই। গাড়ির পর গাড়ি এসে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার দোকানের সামনে। চপ বেচেই বড়লোক হয়ে যাবো।

তুমি কথা শুনে হাসতে।

বলতে, তা আর করবি না? চপ বিক্রী করেই তো খাবি!

খাওয়ার কথা ভাবলে আরো কত কথা যে মনে হয়, তোমার রান্নার কথা। ইলিশ মাছ রাঁধতে তুমি কতরকম, ভাপা-ইলিশ, দই-ইলিশ; কালো জিরে সরষে দিয়ে ইলিশের ঝোল। হলুদ রঙা।

সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরবেলায় আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের বাড়িতে জোড়া-ইলিশ রান্না হতোই। তখনকার দিনে সারাবছর ইলিশ মাছ খাওয়ার রেওয়াজ ছিলো না! প্রতি বছর ইলিশ মাছ খাওয়ার মহরৎ হতো সরস্বতী পুজোর দিনে। জোড়া-ইলিশ লাউডগা দিয়ে রান্না হতো। পাতলা ঝোল, কালোজিরে কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে। সে ঝোলের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আর সরস্বতী পুজোর রাত্রিবেলা প্রত্যেক বছরই হতো খিচুড়ি। তেমনি কালীপুজোর দিন

রাত্রে হতো লুচি-মাংস।

মাংসই বা কতরকম করে রাঁধতে জানতে তুমি! অমন হলুদ-রঙা টক-মিষ্টি-ঝাল স্বাদু দই-মাংস আর খাই না! সেই মাংসের ঝোল দিয়ে থালা থালা ভাত খেতাম আমরা। চিতল মাছ, চিতল মাছের মুঠা, চিতল মাছের পেটি, কৈ মাছ, সরষে-কৈ, ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেল কৈ, রুই মাছের দই মাছ, রুইয়ের কালিয়া আরও কত কী রান্না।

বাবার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর বাড়ি ছিলো চট্টগ্রামে। তাঁরই প্ররোচনায় বাবা একদিন শুঁটকি মাছ এনে হাজির করলেন। সকলের প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেওয়ার উপক্রম করলেন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

বাবা বললেন, হোল্-সাম্ ফুড্। ফুল অফ প্রোটিন্। এতো লোকে খায়, আর যাবা খায়, তারা কত খাটতে পারে জানো? ভালো করে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করো। আগে জলে সেদ্ধ করে নাও, কিছু গন্ধ থাকবে না।

তুমি বাবার কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন আপত্তি করতে না। আঁচলের এক কোণায় একটু অগুরু ঢেলে, সেই আঁচল নাকের সামনে ধরে তুমি সেই শুঁটকি মাছ রান্না করলে।

প্রথম দিন বাবা একাই খেলেন, তুমি তো ছুঁলেই না, আমরাও ধারে কাছে গেলাম না। অথচ তখন বাবার শাসন অগ্রাহ্য করি, এমন সাহস আমাদের কোনো ভাই-বোনেরই ছিলো না। এটা খাবো না, ওটা খাবো না, এইসব বায়নাক্কা কোনোদিনও বাবা প্রশ্রয় দেননি।

একদিন মিনু বলেছিল, নিমপাতা খেতে ভালো লাগে না।

বাবা বলেছিলেন, মনে করো, এমন একটা দেশে গেলে, যেখানে খালি নিমপাতারই গাছ। নিমপাতা ছাড়া আর অন্য কোনো গাছই নেই। না সেখানে ধান ক্ষেত, না কোনোরকম ডাল পাওয়া যায়, না

অন্য কিছু, তখন তুমি কী করবে? তুমি কি না খেয়ে থেকে মরে যাবে? না নিমপাতা খাবে?

মুখ বিকৃতি করেও মিনুকে নিমপাতা খেতে হয়েছিল।

বাবার কড়া শাসনে আমাদের তিন ভাই-বোনের মধ্যে কারোরই এই ডাল খাই না, ওই মাছ খাই না এইসব প্রেফারেন্স গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই হয় নি।

যাই হোক, সেই প্রথম দিনের শুঁটকি পর্বর পর থেকেই বাবার পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝেই বাড়িতে শুঁটকি মাছ আসতে লাগলো। ঘোরতর পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়িওয়ালা নেপথ্যে বলতে লাগলেন যে, বাঙাল-গুলোর জন্যে দেশছাড়া হতে হবে।

তখনও ভাগ্যিস দেশ ভাগ হয়নি।

শেষের দিকে মনে আছে, তুমি নিজেও বেশ তৃপ্তি করেই শুঁটকি মাছ খেতে এবং এমন উপাদেয় করে রান্না করতে যে কী বলবো। পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা দিয়ে ভালো শুঁটকি মাছ, ভালোভাবে রান্না করলে তা দিয়ে যে এক থালা ভাত এমনিই খাওয়া যায় তা নিজে খেয়েই বুঝেছিলাম।

বহরমপুরের অনুপমকাকুর স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি তাহেরি রান্না শিখে এলে। তাই নিয়ে চললো ক'দিন এক্সপেরিমেণ্ট। তখন বাঙালী রান্না, এদেশীয় এবং পূর্ববঙ্গীয় এবং কিছু কিছু মোগলাই রান্নারই চল হয়েছে। চাইনিজ খাওয়া তখন কাকে বলে খুব কম লোকই তা জানতেন। স্বাধীনতার এতো বছর পর আজ যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক রুচি গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতার পরে যে দক্ষিণ ভারতীয় এবং উত্তর ভারতীয়; বিশেষ করে পাঞ্জাবের খাওয়ার-দাওয়ার এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আমাদের ছোটা বেলায় তা মোটেই ছিলো না। কোনো নতুন রান্না কোথাও খেয়ে এলে, কী কোথাও তার খবর শুনে এলে তোমার এবং বাবার সে বিষয়ে উৎসাহের অন্ত থাকতো না।

॥ ১৫ ॥

আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে কত যে, আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই বছরে। দু-তিনটে করে বিয়ে লেগেই থাকতো। তখনকার দিনে নাওড়ি-ঝিয়োরীরা এসে বিয়ের আগে থেকেই উপস্থিত হতেন। এক-একটা বিয়ে মানে, এক-এক মাস বাড়ি-ভর্তি লোকজন, অঢেল খাওয়া-দাওয়া, অনির্বাণ চিতার মতো উনুন জ্বলা আর পড়াশুনার বড়ই অসুবিধে।

আগেই বলেছি, পূর্ব-বঙ্গীয় যৌথ পরিবারের অনেক কিছুই ভালো, কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েরা বড়ই অনাদৃত সেখানে। তাদের পরীক্ষা আছে কি নেই, তাদের পড়াশুনার ঘর আছে কি নেই, এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখিনি।

কত আত্মায় স্বজনের বিয়ে হয়েছে, আজ তাঁরা কোথায় কোথায় চলে গেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘর সংসার পেতেছেন। হয়তো ইচ্ছা থাকলেও যোগাযোগ আর নেই। কোলকাতায় যদিও বা তাঁরা আসেন হয়তো আমাদের বাড়িতে তাঁরা আসেনও না ; সময়ও হয় না।

হয়তো সত্যিই হয় না।

মানুষের জীবন এরকমই। যে যার নিজের ঝামেলা, নিজের যন্ত্রণা নিজের ঝক্কি নিয়েই আছে। কিন্তু যোগাযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা তোমাকে জানতেন, তোমার কাছে ছিলেন কখনও, তোমার মধুর ব্যবহারে যাঁরা সিক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও যে তোমাকে আজও মনে করেন না, এমন হতেই পারে না।

তুমি নইলে কোনো বিয়ের সম্বন্ধ হতো না। যদি আমাদের বাড়িতে

কোনো আত্মীয়াকে বরপক্ষ দেখতে আসতেন, তুমি নইলে সে আত্মীয়ার মা-বাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়তেন। তুমি ছিলে বলে যে কত বিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো, বিয়ের সময় যে কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটেনি সেকথা যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।

কেউ তোমাকে মামীমা বলতেন, কেউ বলতেন মামীমা, কেউ বলতেন কাকীমা, কেউ বলতেন পিসীমা, কেউ বলতেন বৌদি, যে যে-নামেই ডাকুক না কেন, তুমি সকলের কাছেই ছিলে সমান প্রিয়।

আজকে তোমার অবর্তমানে বাবার সমস্ত সম্পদ, সুন্দর সাজানো বাড়ি, সাজানো বাগান, সব যেন খাঁ খাঁ করে। মনে হয় লক্ষ্মী চলে গেছে এ-বাড়ি ছেড়ে। তোমার শ্রীহস্তের ছোঁয়া আর যেন কিছুই পায় না এ বাড়ি।

প্রতিবছর চৈত্র-সংক্রান্তির আগে আগে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে সারা বাড়ি পরিষ্কার করাতে, ঝুল ঝড়াতে ; সব কিছু নতুন হতো। পয়লা বৈশাখের আগে আগে কোনো ছুটির দিনে সকালে বাবা ও তুমি একই সঙ্গে নিশ্চয়ই নিউ মার্কেটে যেতে। আমার বরাদ্দ ছিলো প্রতিবছর নববর্ষে আমার ঘরের জন্যে নতুন একটি পাপোষ এবং সুন্দর একটি বেড্-কভার।

তুমি চলে যাবার পর পয়লা বৈশাখকে আর পয়লা বৈশাখ বলে মনে হয় না। সারা বাড়ির চাকর-বাকর, লোকজন, মায় কুকুর-বেড়াল, সকলেই তুমি নেই বলে কেমন মনমরা হয়ে থাকে।

বাড়িতে যা কিছুই রান্না হতো-না-কেন, তুমি সব থেকে আগে, চাকর-ঠাকুর কি খাবে, তাদের ভাগটা আলাদা করে তুলে রাখতে। ড্রাইভার তার ডিউটি শেষ করে যত রাতই হোক না কেন, যখন বাড়ি যেতো, তুমি তাকে নিজে ডেকে জিগেস করতে যে সে খেয়েছে কি না। এবং যদি তার খাওয়ার সময় তুমি নিজে না দেখতে পেতে, তাহলে ঠাকুরকে জিগেস করতে কি খেয়েছে সে।

তুমি চলে গেছ বলে, ওরা যত দুঃখী হয়েছে, তেমন দুঃখী আর

কেউই হয়নি। জন্তু-জানোয়ার তারাও ভালোবাসা বোঝে, তারাও বোঝে কোন্ মানুষটা কোন্ চোখে তাদের দিকে তাকায়, কোন্ মানুষটার অন্তরে তাদের প্রতি কী অনুভূতি আছে, আর আমরা তো মানুষ। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার ভালোবাসা যারা পেয়েছে; তারা তোমার কথা কী এতো সহজে ভুলতে পারে?

আমি চিরদিনই একটু অন্যরকম ছিলাম। সে কারণে, তুমি প্রায়ই আমাকে ভুল বুঝতে। নানা ব্যাপারে তোমাকে আমি ক্ষ্যাপাতাম, তোমার আমাদের নিয়ে ভয়, উৎকণ্ঠা, সবসময় তোমার আঁচলে আড়াল করে রাখার চেষ্টা এইসব নিয়ে।

প্রায়ই তোমাকে বলতাম হাসতে হাসতে, "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী। রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি।"

বাঙালী মায়ের দোষ অনেক। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সেই মা-হারা হয়; সেই-ই জানে তার গুণ।

তিনখানার উপরে যেদিন বাবা চতুর্থ গাড়ি কিনলেন, সেদিন আমি আমার ডাইরীতে লিখেছিলাম, "তোমার বখে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। তুমি কখনোই শুধু যেন বাবার পরিচয়েই পরিচিত হোয়ো না। সংসারে যার নিজের পরিচিতি নেই, যে বাবা-মামা কাকা-জ্যাঠার পরিচয়েই পরিচিত থাকে সে মানুষই নয়।"

এই পাশ্চাত্যদেশীয় মনোবৃত্তি তুমি বরদাস্ত করতে পারতে না। বাবাও পারতেন না। হয়তো আজকেও আমার এই স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী প্রকৃতি, এবং আত্মসম্মানবোধ পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়তো বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আর তুমি তো ভুল বোঝাবুঝির ওপারেই চলে গেছ।

স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর বাবা বললেন, বাড়িতে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হবে, তার চেয়ে আমার অফিসে আসবে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে। কাজ শেখো।

তোমার কড়া শাসনে আমি তখনও এমনই ক্যাবলা ছিলাম যে,

আট নম্বর বাসে উঠে যখন অফিসের দিকে রওনা হলাম, তখন চৌরঙ্গীর মোড়টা ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম না।

একটা বড় মোড় দেখে যখন নেমে পড়লাম এবং বাসটা চলে গেল, তখনই বুঝলাম যে, এটা চৌরঙ্গী নয়। একটা ঝাঁকা মুটে তার ঝাঁকার ওপর বসে বিশ্রাম করছিল, তাকে বললাম, ভাই, এই জায়গাটার নাম কি ?

সে বলল, ওয়েলেস্‌লি বা।

আমি বললাম, ধর্মতলা কোন্‌দিকে যাবো।

সে বলল, যে বাস থেকে নেমেছিলেন, সেই বাসেই তো ধর্মতলা যাবেন।

তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বাসের অপেক্ষায় সময় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বাস এলে ধর্মতলায় পৌঁছলাম।

আরও বেশ কিছুদিন পর আমি তখন কলেজের ছাত্র, তুমি পুজোর সময় আমাকে দুশো টাকা দিলে। বললে, খোকন, তুই খুশীমতো জামা-কাপড় কিনে নিস্।

আমি তোমাকে বললাম, আমি তো অনেক বড় হয়ে গেছি আর রোজগারও করছি। এখন আর আমাকে এমন করে টাকা দিও না। টাকা চাই না আমি। বরং বাবাকে বোলো, যদি বাবা মনে করেন, তাহলে আমার মাইনে একটু বাড়িয়ে দিতে। বড় হয়ে যাবার পর হাত পেতে টাকা নিতে লজ্জা করে।

তুমি পুরোপুরি বাঙালী মায়েরই মতো তোমার দুর্বিনীত ছেলের কথাতে ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললে।

বললে, তাহলে তোর বাবা এতো টাকা কেন রোজগার করেন ?

আমি বলেছিলাম, সেকথা তুমি বাবাকেই জিজ্ঞাসা কোরো। সেকথা আমার জানার নয়। কিন্তু বাবার রোজগারের টাকাতে আমার কোনো অধিকার নেই ; এবং সেটাকা নিতেও আমি রাজী নই।

জানি না, হয়তো তুমি চলে যাবার আগে আগে বুঝে ছিলে কি না,

যে, তুমি আমাকে যতখানি অবাধ্য ভাবতে, যতখানি দুর্বিনীত ভাবতে, আমি ঠিক ততখানি ছিলাম না।

হয়তো অন্যরকম ছিলাম, কিন্তু সেটা তোমাদের অপমান করার জন্য নয়।

হয়তো অন্য দেশে জন্মালে আমার এই মানসিকতা, অন্যের প্রশংসার দাবী রাখতো।

যেহেতু আমি এই দেশে জন্মেছিলাম, যেহেতু এই দেশে এইরকম মানসিকতা সাধারণ ছিলো না, বিশেষ করে ঐ সময়ে; সেইহেতু আমাকে চিরদিনই ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়েছে।

তুমি যে কত বুঝদার ছিলে! তোমার জন্য কিছুমাত্র করতে গেলে, তুমি সব সময় বলতে না, না। থাক্ থাক্। তোর কত অসুবিধা তোর কত খরচ. তুই এতো টাকা দিবি আমাকে? আমার জন্যে তুই এতো ভালো শাড়ি কিনলি?

আমি বলতাম, তোমাকে দেবো না তো কাকে দেবো?

তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলাম যে শুধু মা বাবাকে নয়, সবাইকে দেওয়ার আনন্দ কী! বিনা-স্বার্থে, বিনা-কারণে কারো জন্যে কিছু মাত্র করার সমস্ত আনন্দটুকুই যে করে তা যে তারই একার।

এই অকৃতজ্ঞ, হিসেবী, ভণ্ড, চক্ষু-লজ্জাহীন জগতে তোমাকে লোকে বোকা বলতো।

বলে, আমাকেও।

কিন্তু যে চক্ষুলজ্জাহীন ভণ্ড মানুষরা তা বলে, তাদের হাসিমুখে ক্ষমা করার ক্ষমতাও তুমিই দিয়েছিলে।

জীবনে যা পেয়েছি, ভবিষ্যতে যাই-ই পাব, তার সমস্তটুকুই তোমারই দেওয়া। তোমার প্রত্যেকের প্রতি নিষ্কলুষ শুভকামনায় ভরা, আতরগন্ধী অন্তরের ঔদার্যের কারণে।

সেই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার।

তুমি উইল করে কিছুই দাওনি আমাকে। দিলেও নিতাম না আমি!

কিন্তু যা তুমি দিয়েছিলে, সেই সম্পদ অমূল্য। সে সম্পদ সকলে অন্তরে ধরে রাখতে জানে না। সকলের অন্তরে ভগবান সে ঔদার্য দেনও না।

এ সংসারে গরীব সেজে থাকা, কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করা, টাকা পয়সাকেই পরমধন বলে জানাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

আমি সেই অর্থে বুদ্ধিমান নই। তুমি আমাকে সেই দুর্বুদ্ধি দাওনি কোনোদিন। তোমার কাছে আমি এ কারণে আজীবন, অশেষ কৃতজ্ঞ।

কাউকে কিছু দেওয়ার, দিতে পারার আনন্দ যে কী, কতখানি ; তা সেই সব ভণ্ড মানুষরা, সাবধানী অর্থগৃধ্ন মানুষেরা কখনও জানলো না, জানবেও না।

একটা কথা ভেবেই আমার বড় দুখ হয় যে, আমাকে তুমি খুবই ভালোবাসতে বলেই আমার দ্বারা তুমি অনেক দুঃখও পেয়েছো।

আজকে তুমি নেই। আমার ব্যাখ্যা হয়তো কোনো প্রয়োজনে লাগবে না তোমার। তবু আমার বিবেকের কারণে, আমার নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহি করার কারণে আমি একথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

সংসারে অনেক দুঃখই মানুষকে পেতে হয়। আর্থিক দুঃখ, পারমার্থিক দুঃখ, এর মধ্যে কোনো দুঃখ অন্যর চেয়ে বড় অথবা ছোট নয়। যে-দুঃখ আমাদের পেতে হয়ই, তার কিছুকিছু আমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। কিন্তু এমন অনেক দুঃখও পেতে হয়, যার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী নই।

যে সব দুঃখ আমার কারণে তুমি পেয়েছিলে, তার জন্য তুমি নিজে বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলে না। অথচ দুখ তোমাকে পেতেই হয়েছিল। তোমার সেই পুরনো গানের কথাতেই বলি, যার দুঃখ, তার সুখ, সুখের উপরে দুখ।

যে মানুষ দুঃখ সইতে না জানে, যে মানুষ দুঃখ এবং আনন্দকে সমান

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবনে স্বীকার করতে না জানে, সে মানুষই নয়।

এ তো তোমারই শিক্ষা, তুমিই তো আমাকে এই কথা শিখিয়েছিলে, তাই মাঝে মাঝে যখন মাঝরাতে ঘুম আসে না, একা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, তুমি কী সুখে আছো ?

অথবা তুমি কি সুখে আছো ?

তুমি কি সব দুঃখের দুয়ার পেরিয়ে গিয়ে এক প্রগাঢ় আনন্দের জগতে বাস করছো ?

না কি শরীরের খাঁচা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পরও আত্মার দুঃখ থাকে ?

তখনও কি আত্মা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখে কাতর হয়, তখনও কি তার পুরনো আবাসের কাছাকাছি সে ঘুরে বেড়ায় ?

যখন খুব ঝড় ওঠে, প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ে, বজ্রপাত হয় ; তখন ভাবি তুমি কোথায় আছো ?

তুমি কি বিদ্যুৎ চমকে ভয় পাচ্ছ ? তুমি বড্ড ভয় পেতে বাজ পড়লে। বাচ্চা মেয়ের মতো।

তোমার মাথায় কি ছাদ আছে মা ? মহাশূন্যের ঘরের জানালা দরজাগুলো ঝড় ওঠার আগে তোমার চুড়ি-পরা সোনার বরণ আঙুলে তুমি কি বন্ধ করে দিয়েছো ?

না, তুমি এই দুর্যোগের রাতে ভিজে গিয়ে ঝড়ে জলে অন্ধকারে শীতে কেঁপে উঠছো ?

কিছুই জানি না। অথচ কত কিছুই জানি আমরা। আমরা জানি মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, আমরা জানি মানুষের মগজ বাইরে বের করে এনে মানুষের মগজে বড় বড় সার্জেনরা অপারেশন করছেন।

আমরা জানি যে শীগগিরই ক্যান্সারের ওষুধ বেরোবে।

আমরা জানি যে, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, কিন্তু এদের মধ্যে একজনও অন্যের মতো নয়, নয় শরীরে, নয় মনে।

আমরা জানি এক মা-বাবার একাধিক সন্তান হয়, অথচ তারাও কেউ নয় একে একে অন্যের মতো, নয় মনে। নয় স্বভাবে।

তাইতো ভগবান বিশ্বাস করি।

বিজ্ঞান শুধু আবিষ্কারই করে, বিজ্ঞান কিছুই উদ্ভাবন করে না।

যা তাঁরই ছিলো, যা তাঁরই দান, যা তাঁরই সৃষ্টি, তাঁকেই ভাস্কো-ডা-গামার মতো পালতোলা নৌকোয় চড়ে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করে, এবং আবিষ্কার করে মিথ্যা উদ্ভাবনের আত্মশ্লাঘায় বেঁকে ওঠে।

যদি আমাদের পুণ্য আত্মার মৃত্যু না হয় কখনও তবে তুমি নিশ্চয়ই আছো আমার কাছেই, দিনের আলোর উজ্জ্বল উদ্ভাসের গভীরে উদ্বেল অন্ধকার রাতের তারার যেমন থাকে!